গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ২৭ সংখ্যা | ১৪ - ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

স্বাস্থ্য বাজেটে স্বাস্থ্য ফিরবে শুধু বহুজাতিকের

প্রতিবারের মতোই গালভরা প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাজেট পেশ হল। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন— টিবি হারেগা, দেশ জিতেগা। অর্থাৎ ২০২৫ সালের মধ্যে দেশ থেকে ক্ষয়রোগ (টিবি) তাঁরা নির্মূল করবেন। কিন্তু কীভাবে?

স্বাস্থ্যখাতে এ বছর বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৬৯ হাজার কোটি টাকা। এমনিতে দেখলে তা গত বছরের তুলনায় ৩.৯ শতাংশ বেশি। অথচ খোদ সরকারের নীতি আয়োগ গত বছর সুপারিশ করেছিল ২০২৫ সালের মধ্যে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপির অন্তত ২.৫ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ করতেই হবে। কিন্তু এবছর স্বাস্থ্য বাজেট জিডিপি-র মাত্র ১ শতাংশ। মূল্যবৃদ্ধি ধরলে আসলে বাজেট সংকোচন হয়েছে। অর্থাৎ বিজেপি সরকার স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাত-পা বেঁধে দিয়ে সামনে ছুটে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। এই পরিসংখ্যান দেখলে আমাদের চেয়ে পিছিয়ে পড়া প্রতিবেশীদের (শ্রীলঙ্কা জিডিপি-র ২ শতাংশ, থাইল্যান্ড ৩.৬ শতাংশ) থেকেও আমাদের মুখ লুকোতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার পিছনে ৬ হাজার কোটি টাকা ঢালার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশ ঃ কতটা বাস্তব কতটা নিছক প্রচার

কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে রাজ্যের বিজেপি সভাপতি সবার মুখে অনুপ্রবেশের কথা খুব শোনা যাচ্ছে। তাঁদের কেউ বলছেন এ রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যাটা এক কোটি, কেউ বলছেন, ২ কোটি।

বিজেপি নেতারা মানুষকে বোঝাচ্ছেন, যেভাবে অনুপ্রবেশ হচ্ছে তাতে দেশটা অনুপ্রবেশকারীতেই ভরে যাবে। আর মানুষের এই যে দুরবস্থা, এই যে মূল্যবৃদ্ধি, এত যে বেকারি, এই সব কিছুর জন্য দায়ী এই অনুপ্রবেশকারীরা। তারাই মানুষের রুজি-রোজগার সব লুঠ করে নিচ্ছে। তাই অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করে বিজেপি নেতারা তাদের তাড়িয়েই ছাড়বেন এবং দেশের মানুষের রুটি-রুজির গ্যারান্টি ফিরিয়ে আনবেন।

কিন্তু তাঁরা যে বলছেন, দু'কোটি কিংবা কোটি কোটি অনুপ্রবেশকারী ভারতে ঢুকে পড়েছে, এই সংখ্যাটা তাঁরা পেলেন কোথায়? তাঁরা কি সরকারি রেকর্ড থেকে

দুয়ের পাতায় দেখুন

কিশোরী ধর্ষণ, একবালপুর থানায় বিক্ষোভ

কলকাতার একবালপুরে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণধর্ষণে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস-এর একবালপুর থানায় প্রবল বিক্ষোভ। ৯ ফেব্রুয়ারি (খবর ৫ পাতায়)

বিধানসভায় যুবশ্রী কর্মপ্রার্থীদের বিক্ষোভ

৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতির পক্ষ থেকে বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনে বিধানসভার উত্তর ফটকে যুবশ্রীদের চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

প্রথমে সকালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে সংগঠনের নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং সাক্ষাতের জন্য ৩ জনকে ডেকে পাঠানো হয়। বহুক্ষণ অপেক্ষার পরও তিনি দেখা করেননি। বিগত ছয় মাস ধরে বহুবার নবান্ন তথা কালীঘাটে তাঁর সাথে দেখা করার চেষ্টা করা হলেও তিনি দেখা করেননি।

এরপর 'যুবশ্রী'রা একপ্রকার বাধ্য হয়েই বিধানসভার উত্তর ফটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে, সেই সময় পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে তাঁদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। সংগঠনের উপদেষ্টা সুচেতা কুণ্ডু, সহ-সভাপতি সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, যুগ্ম সম্পাদক নিতাই বসাক, চন্দ্রকান্ত কুইল্যা, অফিস সম্পাদক এবংকোষাধ্যক্ষ প্রণয় সাহা সহ চৌত্রিশ জনকে অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়।

এনআরসি চাই না চাকরি চাই— এই দাবিতে হাজার হাজার কর্মপ্রার্থী সামিল হয়েছিলেন। তাদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে পুলিশি নির্যাতনকে ধিক্কার জানিয়ে যুবশ্রীরা দাবি জানায়, অবিলম্বে সমস্ত শূন্যপদে যুবশ্রী থেকে নিয়োগ করতে হবে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী উক্ত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা তথা আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত যুবশ্রীদের এই আন্দোলন চলবে।

বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ

দীর্ঘ আন্দোলনে পরিবহণ শ্রমিকদের দাবি আদায়

পণ্য পরিবহণ শিল্পে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি থাকা সত্ত্বেও এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীরা পি এফ, ই এস আই, এইচ আর সহ সমস্ত আইনানুগ অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ইউনিয়নের নেতারা ত্রিপাক্ষিক চুক্তির শর্তগুলিকে ধুলিসাৎ করে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি করে। ফলে পরিবহণ শিল্পে কার্যত চলছে জঙ্গলের রাজত্ব। এই অসহনীয় অবস্থায় জয় মাতাদি পরিবহণ প্রাইভেট লিমিটেড-এর শ্রমিকরা এআইইউটিইউসি অনুমোদিত 'লরি ট্রান্সপোর্ট কর্মচারী ইউনিয়ন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর সদস্য হয়ে আন্দোলন শুরু করে। মিছিল-মিটিং-অবস্থান আন্দোলনের পরেও কর্তৃপক্ষ দাবি সনদ নিয়ে এই ইউনিয়নের সাথে আলোচনায় বসতে সম্মত না হওয়ায় ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয় এবং লেবার দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। কর্তৃপক্ষের টালবাহানা ও দীর্ঘসূত্রতা মোকাবিলা করে ২৭ জানুয়ারি নিউ সেক্রেটারিয়েট শ্রমদপ্তরে ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

সমস্ত শ্রমিককে পি এফ, ইএসআই এবং বাড়ি ভাড়া ভাতা দেওয়ার দাবি জয় মাতাদি পরিবহণ প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন— যা পরিবহণ শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য জয়। বছরে ১৫ দিন উৎসবের ছুটি ও ৩০ দিন আর্নড লিভও শ্রমিকরা পাবেন। প্রত্যেক শ্রমিকের প্রতি বছর ১০০০ টাকা মাসিক বেতন বৃদ্ধি হবে। ইউনিয়নের সম্পাদক শান্তি ঘোষ বলেন, আন্দোলনের লক্ষ্য ও নেতৃত্ব সঠিক থাকলে আজও দাবি আদায় করা সম্ভব। এআইইউটিইউসি সারা ভারতে শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে চলেছে। আজকের এই জয় শ্রমিক আন্দোলনে আপসমুখীনতা ও সংশোধনবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা শ্রমিক আন্দোলনের জয়।

অনুপ্রবেশ নিছক প্রচার

একের পাতার পর

এই সংখ্যা দিচ্ছেন, নাকি নিজেরা কোনও সমীক্ষা করেছেন, নাকি তাঁদের যার যা মনে আসছে তাই বলছেন। যদি সরকারি সমীক্ষা থেকে তাঁরা এই সংখ্যার উল্লেখ করেন তবে কোন সে সমীক্ষা, যার থেকে তাঁরা উদ্ধৃতি দিচ্ছেন?

ভদ্রলোকের এক কথা

তাঁদের বক্তব্য সম্পর্কে এই প্রশ্নের কারণ আজ থেকে প্রায় দু'দশক আগে (২০০২) বিজেপির প্রথম সারির নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তিনি পশ্চিমবাংলায় এসে যথারীতি অনুপ্রবেশ নিয়ে একই রকম উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, এ রাজ্যে ২ কোটি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে এবং সরকার তাদের খুঁজে বের করবে। তাঁরা আরও বলছেন, প্রতিদিন দলে দলে বাংলাদেশি সীমান্ত পার হয়ে এ রাজ্যে ঢুকে যাচ্ছে। এটা সত্যি হলে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা একই রয়ে গেল কী করে? তবে কি তাঁদের এ অভিযোগ সত্যি নয়? তা হলে এই যে বিজেপি নেতারা মানুষের জীবনের গুরুতর সমস্যাগুলি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, চিকিৎসার সংকট, নারী নির্যাতন, সেগুলিকে বাদ দিয়ে শুধু অনুপ্রবেশ নিয়েই হইচই করছেন, এর কারণটা কী?

নিছকই প্রচার

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের আগেকার কথা অনেকেরই মনে আছে। কংগ্রেসের দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার দুর্নীতিতে গলা পর্যন্ত ডুবে গেছে। মূল্যবৃদ্ধি থেকে বেকারি— কংগ্রেসের অপশাসনে জর্জরিত সাধারণ মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তন চাইছে। কিন্তু মানুষ তো শুধু সরকারের পরিবর্তন চাইছে না, পরিবর্তন চাইছে আসলে সরকারের জনবিরোধী নীতির। তারা চাইছে এমন একটা নীতি, যা তাদের জীবনে কল্যাণ নিয়ে আসবে। কিন্তু কোন দল সেই নীতি নিয়ে আসবে? বেশির ভাগ জনগণের তা জানা নেই। তারা নীতির পরিবর্তন চায়, কিন্তু কোন পথে তা আসবে তা তাদের জানা নেই। সক্রিয় হয়ে উঠল দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি। মানুষের এই পরিবর্তনের আকাঙ্খাটাকে তারা ভয় পায়। কে জানে, বলা তো যায় না, এই আকাঙ্খা না পুঁজির আসন ধরে টান দেয়! ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যমগুলি। কংগ্রেসের মতোই তাদের অপর একটি অনুগত দল বিজেপিকে সামনে নিয়ে এল। কিন্তু সামনে নিয়ে এলে তো হবে না, মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা চাই তো। এমন করে তুলে ধরতে হবে যেন মানুষ মনে করে, হ্যাঁ, এরাই তাদের মঙ্গল করবে, এদের নীতি কংগ্রেসের থেকে আলাদা। তাই বিজেপি নেতাদের মুখ দিয়ে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হল। মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখানো হল, 'আচ্ছে দিনের' গল্প শোনানো হল। বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদিকে 'বিকাশ পুরুষ' হিসাবে তুলে ধরা হল। এ-সব প্রচারের জন্য টাকা ঢেলে দিল বড় বড় ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিরা। হই হই করে জিতে সরকার গড়ল বিজেপি।

কিন্তু এক মাঘে তো শীত যায় না। ২০১৯-এ আবার এল নির্বাচন। ততদিনে মানুষ বুঝে গেছে, গতবারের প্রতিশ্রুতি সবই ছিল ভাঁওতা, অমিত শাহের ভাষায়— জুমলা। তাই এবারের নির্বাচনের আগে পুলওয়ামা ঘটাতে হল, বালাকোটের গল্প ফাঁদতে হল। উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগির তুলতে হল। আবার এল জয়। কিন্তু বিজেপি নেতারাও জানেন নকল দেশভক্তির এই ফানুস ফাটবেই। কারণ এ দিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষের পেট ভরবে না। তাই এবার চাই নতুন স্লোগান, নতুন ইস্যু। এমন ইস্যু তুলতে হবে যাতে সরকার হিসাবে তাদের এতদিনের ব্যর্থতাকে চাপা দেওয়া যায়। বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, মন্দা সবকিছুকে চাপা দিয়ে দেওয়া যায়। শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তে দায়ী করা যায় অন্য কিছুকে, অন্য কাউকে। বিজেপি নেতারা সামনে নিয়ে এলেন 'অনুপ্রবেশ' ইস্যুটিকে।

অনুপ্রবেশ যদি হয় তবে তা ঘটছে কী করে

বিজেপি নেতারা কাদের অনুপ্রবেশকারী বলছেন? যাঁরাই বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তান থেকে এ দেশে এসেছেন তাঁরা কি এমন সবাইকেই অনুপ্রবেশকারী বলছেন? না। প্রথমে দেশভাগ এবং তারপর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই দুই দেশ থেকে যাঁরা এ দেশে এসেছেন, বিজেপি নেতারা তাঁদের ধর্মের ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করছেন। যে সব হিন্দুরা এই সব দেশ থেকে এসেছেন তাঁদের তাঁরা বলছেন শরণার্থী। আর যে মুসলমানরা এসেছেন তাঁদের বলছেন অনুপ্রবেশকারী। বাস্তবে দেশভাগের সময়ে এসেছে কারা? মূলত হিন্দুরা। আর বহু মুসলিম দেশভাগের আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পরে বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এ দেশ থেকে বাংলাদেশে চলে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়েও এসেছে মূলত হিন্দুরাই। তা হলে কোটি কোটি অনুপ্রবেশকারী কখন ঢুকল?

দ্বিতীয়ত, অনুপ্রবেশ নিয়ে যদি বিজেপি নেতারা সত্যিই উদ্বিগ্ন হতেন তবে তাদের ধর্মের ভিত্তিতে এভাবে ভাগ করতেন না। আসলে অনুপ্রবেশ নয়, বিজেপি নেতারা চিন্তিত অনুপ্রবেশকে ইস্যু করে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি নিয়ে। বাস্তবে অনুপ্রবেশ ইস্যুটি হল বছরে ২ কোটি চাকরি কিংবা সবার অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ভরে দেওয়ার মতোই আর একটি গাঁজাখুরি গপ্পো। না হলে উত্তরপ্রদেশে মাত্র ৩৬৮টি পিওন পদের জন্য যে ২৩ লক্ষ বেকার আবেদন করেছিল, তার জন্য কি অনুপ্রবেশ দায়ী? নাকি দেশের ৭০ শতাংশ সম্পদ যে এক শতাংশ ধনকুবেরের হাতে জমা হয়েছে তার জন্য অনুপ্রবেশ দায়ী? কিংবা প্রতিদিন যে শত শত কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার জন্য অনুপ্রবেশ দায়ী? এ সব প্রশ্নের উত্তর বিজেপি নেতারা দেবেন না। কারণ তা হলে তাঁদের প্রতারণার রাজনীতির মুখোশটা খুলে যাবে।

সরকারি হিসেব কী বলছে

বিজেপি নেতারা মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে জুজু দেশের মানুষকে দেখাচ্ছেন, তা প্রমাণ করার মতো তাঁদের কাছে কোনও তথ্যই যে নেই, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। অথচ প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনার রিপোর্ট সরকারের হাতে রয়েছে। সেই রিপোর্ট বিচার করলেই সত্যটা একেবারে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। অনুপ্রবেশের পরিমাণ যদি খুব বেশি হয় তবে জনগণনায় তা ধরা পড়বে। যে রাজ্যে এমন অনুপ্রবেশ ঘটছে সেখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেশের গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকে অনেকখানি বেশি হবে। বিজেপি নেতাদের কথামতো অনুপ্রবেশের সংখ্যা যদি এমন কোটিতে কোটিতে হত তবে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটাও সেই অনুপাতে হঠাৎ বেড়ে যেত। বাস্তবে জনগণনার পরিসংখ্যান কী বলছে?

১৯৯১ সালের গণনা অনুযায়ী দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ছিল ২৩.৯ শতাংশ। ২০০১-এর গণনায় তা কমে হয়েছে ২১.৫ শতাংশ। ২০১১-র গণনা দেখিয়েছে এই বৃদ্ধির হার আরও কমে হয়েছে ১৭.৬। কেউ ভাবতে পারেন, অন্য রাজ্যের বৃদ্ধির হার কম এবং পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধির হার বেশি হলেও গড়ে এ রাজ্যের হার কমে যেতে পারে। তা হলে আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধির হার দেখা যাক। জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী, '৯১-এর গণনায় পশ্চিমবাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৪.৭৩ শতাংশ। '০১ সালের গণনায় তা নেমে আসে ১৭.৭৭-এ। ২০১১ সালের রিপোর্টে তা আরও নেমে দাঁড়িয়েছে ১৩.৯৩ শতাংশে। '৮১-র গণনা থেকেই দেখা যাচ্ছে এই হার ক্রমাগত নেমে আসছে। তা হলে বিজেপি নেতাদের কথা মতো যে কোটি কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এ দেশে প্রতিদিন ঢুকে পড়ছে এবং স্থানীয় মাতব্বরদের সহায়তায় ভোটার তালিকায় নাম তুলে দিব্বি নাগরিক হয়ে বসে থাকছে, তারা সব গেল কোথায়? কোনও তথ্য বা যুক্তির পরোয়া না করেই বিজেপি নেতারা ছড়িয়ে দিচ্ছেন যে, দলে দলে বাংলাদেশির ভারতে ঢুকে পড়ে ভারতের অর্থনীতিকে তছনছ করে দিচ্ছে। এর জন্যই চাই নাগরিক পঞ্জি এবং সিএএ।

মুসলিম জনসংখ্যা কি হিন্দুদের ছাড়িয়ে যাবে

বিজেপি নেতারা আরও একটা প্রচার করছেন যে, অনুপ্রবেশের ফলে মুসলমানের সংখ্যা এত হারে বাড়ছে যে অতি দ্রুত মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদেরও ছাড়িয়ে যাবে। এই দাবিটা বিচার করে দেখা যাক। ২০১১-র গণনায় দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমছে। ২০০১-এ এই হার ছিল ২৯.৬ শতাংশ, ২০১১-য় তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৬ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার হিসেব কষলে দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের বৃদ্ধি যে হারে কমছে তার চেয়ে ৫০ শতাংশেরও বেশি হারে কমছে মুসলমানদের জনসংখ্যা। বৃদ্ধির হারের এই কমতি '৮১-র গণনা থেকে দেখা যাচ্ছে টানা কমে আসছে। '৮১ থেকে '৯১ এই হার ছিল ৩২.৯ শতাংশ, '৯১-'০১-এ ছিল ২৯.৬ শতাংশ, '০১-'১১তে দাঁড়িয়েছে ২৪.৬ শতাংশ। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি। বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সত্যের দূরত্ব যেহেতু বহু যোজনের তাই তাঁরা এই মিথ্যা প্রচার চালিয়েই যাবেন।

মুসলমান মহিলাদের মাথাপিছু গড় সন্তানের সংখ্যা ৩.১, আর হিন্দুদের ২.৭ এবং খ্রিস্টানদের ২.৩টি। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির এটি একটি উল্লেখযোগ্য কারণ— অনুপ্রবেশ নয়। আবার মেয়েদের গড় বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও যে মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিম্নমুখী, তাতে বোঝা যায়, এই অংশের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। যতই শিক্ষার হার বাড়বে, মেয়েরা কাজের জগতে বেশি করে আসবে ততই এই হার আরও দ্রুত নামতে থাকবে। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জনসংখ্যার যে অংশের মধ্যে সচেতনতা এবং শিক্ষার হার কম সেই অংশের জন্মহার উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় সমান এবং তা গড় হারের থেকে অনেক বেশি। ফলে এর সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই।

সীমান্ত পেরিয়ে দলে দলে ঢোকা কি সম্ভব

বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, প্রতিদিন অজস্র বাংলাদেশি মুসলমান সীমান্ত পেরিয়ে এ দেশে ঢুকে পড়ছে। কিন্তু বাস্তবে কি তা সম্ভব? কেন সম্ভব নয়? সম্ভব নয় কারণ, বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক, হিন্দুত্ববাদী, মুসলিম বিদ্বেষী একটি দল অনুপ্রবেশকে ভোটের ইস্যু করার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে অনুপ্রবেশ ঘটলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া হবে। আর এখন তো দীর্ঘ দিন ধরে কেন্দ্রে বিজেপিরই সরকার। সীমান্তে প্রহরারত রয়েছে যে নিরাপত্তা বাহিনী তা তো কেন্দ্রীয় সরকারেরই অধীন। সেই বাহিনীর নিশ্ছিদ্র প্রহরা এড়িয়ে প্রতিদিন হাজারে হাজারে বাংলাদেশি এ দেশে ঢুকে পড়ছে, এটা কি বাস্তবে ঘটতে পারে? তা যদি সত্যি হয় তবে তো সবার আগে নিরাপত্তা বাহিনীর দক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাবে। দেশের নিরাপত্তাও প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে। তাই যদি হয়, তবে তো সবার আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে অমিত শাহকেই নিজের ব্যর্থতার কথা, অপদার্থতার কথা স্বীকার করতে হয়। তা তিনি করবেন কি? তা ছাড়া তাঁরা কেন বলছেন না যে, সীমান্তে তাঁরা এমন ব্যবস্থা নেবেন যে আর কোনও অনুপ্রবেশকারী এ দেশে ঢুকতে পারবে না? এর থেকেই তো বোঝা যায় সত্যিই অনুপ্রবেশটা তাঁদের কাছে কোনও সমস্যা নয়, তাঁরা শুধু এটা প্রচার করে এর থেকে ফয়দা তুলতে চান।

গত দশকের শেষ থেকেই দেশের অর্থনীতিকে গ্রাস করেছে এক মহামন্দা। আজও সেই মন্দায় হাবুডুবু খাচ্ছে অর্থনীতি। অর্থনীতির বৃদ্ধির হার নেমে এসেছে ৫-এর নিচে। তার পরিণতিতে উৎপাদন শিল্পে লকআউট লে-অফ লেগেই আছে। ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে লাখ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। অর্থনীতির কোনও বিশেষজ্ঞই কিন্তু এই সংকটের জন্য অনুপ্রবেশকে দায়ী করেননি। প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী কিংবা বিজেপির কোনও নেতা-মন্ত্রীও বলেননি যে এর জন্য অনুপ্রবেশকারীরা দায়ী। বরং তাঁদের সরকারের পুঁজিবাদী নীতিই যে এর জন্য দায়ী, সেটিকে আড়াল করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মন্দাকেই দায়ী করেছেন। তা হলে বিজেপি নেতাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা একরকম, আর রাজনৈতিক ব্যাখ্যাটা কি অন্য রকম? এর থেকেই বোঝা যায়, অনুপ্রবেশ নিয়ে তাঁদের প্রচার আসলে উদ্দেশ্যমূলক।

এমন প্রচারের উদ্দেশ্য কী

বিজেপি নেতাদের এসব যুক্তি জানা নেই, এমনটা হতে পারে না। তবু যে তাঁরা এই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তার কারণ তাঁরা তো দেশের কল্যাণ, মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে এসব করছেন না, করছেন ভোটের লক্ষ্যে। যেভাবে হোক হিন্দু মনকে আতঙ্কগ্রস্ত করে ভোটব্যাঙ্ক গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য। তাই গোয়েবলসীয় কায়দায় মিথ্যাকে তারা বারে বারে বলে মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চান। যেহেতু পুঁজিবাদী শোষণে এবং শাসক বুর্জোয়া দলগুলির লাগাতার প্রতারণায় মানুষের মন ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে, তাই এমন একটা চটকদার প্রচারে অনেকে বিভ্রান্তও হয়ে যান। কিন্তু তাঁরাও যদি একটু তলিয়ে বিচার করেন তবে এর মিথ্যার দিকটা সহজেই ধরতে পারবেন।

বাস্তবে অনুপ্রবেশ কি ঘটছে না? ঘটছে। বিশ্বের সব দেশেই কম-বেশি ঘটে চলেছে। প্রতিবেশী দুটি দেশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত অর্থনীতির দেশে মানুষ কাজের খোঁজে, জীবন-জীবিকার অপেক্ষাকৃত উন্নত সুযোগের আশায় অনেক সময়েই চলে আসে। আর সে দুটি দেশ যদি একই ভাষাভাষী হয়, একটি মূল দেশ ভেঙেই দুটি দেশ তৈরি হয় তবে তো কথাই নেই। কিন্তু সেই সংখ্যাটাও বিজেপি নেতারা যেভাবে প্রচার করছেন তার ধারেকাছেও আছে বলে কোথাও কোনও প্রমাণ নেই। জীবিকার খোঁজে এমন অনুপ্রবেশ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই রয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশ আমেরিকাতে কি প্রতিবেশী মেক্সিকোর মানুষ আসছে না? আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যের ভেঙে পড়া অর্থনীতির

সাতের পাতায় দেখুন

নাগরিকত্ব নিয়ে বিজেপির প্রচার সঠিক নয়

ভারতের রাজপথ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সোচ্চার। ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে রাজ্যে রাজ্যে দিবারাত্র অবস্থান-বিক্ষোভ ধরনা চলছে শান্তিপূর্ণভাবে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। যতদিন যাচ্ছে আন্দোলনের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। ছাত্র-যুব সমাজ এই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। মহিলারাও সদ্যোজাত সন্তান নিয়ে শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল। আন্দোলনের পিছনে বিরাট সামাজিক সমর্থন ছাড়া এ জিনিস কল্পনাতীত। জাতি-ধর্ম-বর্ণের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই আন্দোলন সম্পূর্ণ গণচরিত্র অর্জন করেছে। এই রকম একটি সর্বজনীন গণআন্দোলনকেও ন্যূনতম মূল্য দিচ্ছে না কেন্দ্রের মোদি সরকার। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হুঙ্কার দিয়েছেন সিএএ লাগু হবেই। সরকারের এই মনোভাব লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলছে। রাস্তাই একমাত্র রাস্তা বলেছিলেন এক কবি। সেই রাস্তাই এখন বাঁচার রাস্তা দেখাচ্ছে। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে বিজেপি সরকার যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ করিয়েছে, এই আন্দোলন পণ করেছে তাকে ছুঁড়ে ফেলার। সরকারও হাত গুটিয়ে বসে নেই। আন্দোলন দমনে বহুবিধ পথের সাথে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কৌশলও অব্যাহত রেখেছে। সেই বিভ্রান্তির জবাবে কী বলছেন, আন্দোলনকারীরা?

প্রশ্ন ঃ মোদি সরকার একটা ভাল আইন করেছে ওদেশ থেকে আসা অসহায় মানুষদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য। আপনারা তার বিরোধিতা করছেন কেন?

উত্তর ঃ আপনি কী করে বুঝলেন আইনটা ভাল? আপনি কি গভীরে ভেবে দেখেছেন তথাকথিত এই 'ভাল' আইন আপনাকে কোন ফাঁদের মধ্যে ফেলবে? শুনে রাখুন, এই আইনে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য প্রথমেই আপনাকে হলফনামা দিয়ে ঘোষণা করতে হবে, আপনি বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগানিস্তান থেকে এ দেশে এসেছেন। অর্থাৎ আপনি নিজেই ঘোষণা করলেন, আপনি এ দেশের নন, বিদেশি। এই ঘোষণার ফলে আপনার ভোটার কার্ড, রেশনকার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড ইত্যাদির বৈধতাও প্রশ্নের সামনে পড়ে যেতে পারে ! শাস্তির মুখেও পড়তে পারেন। কারণ আপনি সরকারি কর্তৃপক্ষকে ভুল তথ্য দিয়ে এইসব কার্ড করিয়ে নিয়েছেন। শাস্তির মুখে পড়তে পারেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরাও।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের নেতামন্ত্রীরা বলছেন, নাগরিকত্বের জন্য আবেদনপত্রের সাথে আপনাকে দিতে হবে ধর্মের প্রমাণপত্র। কোত্থেকে জোগাড় করবেন ধর্মের প্রমাণ? ধর্মের সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকারী কোন সংস্থা? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে, নিজের দেশের বিভিন্ন সরকারি নথিতে যে ধর্মের উল্লেখ করেছেন, সেই ধাঁচের কোনও কাগজ ভারত সরকারের কাছে দিতে হবে। প্রশ্ন হল, যাঁরা ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে দেশ ছেড়ে, একবস্ত্রে এ দেশে এসেছেন, তাঁরা কোথায় পাবেন কাগজপত্র।

তৃতীয়ত, শুধু ধর্মের প্রমাণ দিলেই হবে না। আপনাকে সরকারি দলিলপত্র দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, উক্ত দেশগুলিতে আপনি ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে এ দেশে এসেছেন। এটা কীভাবে প্রমাণ করবেন? আপনার উপর অন্য ধর্মের লোকেরা আক্রমণ করেছে তার কোনও ফটো বা ভিডিও রেকর্ডিং আছে? আপনি কি বাংলাদেশ থেকে আসার সময় ওখানকার থানায় অভিযোগ করে এসেছেন যে, আপনি ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন? সেই অভিযোগের কপি আপনার আছে? মনে রাখবেন, কোনও স্তরেই মৌখিক স্বীকারোক্তির কোনও মূল্য নেই।

উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির দোমোহনায় নাগরিক অবস্থান

সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ১২৩ কোটিরও বেশি মানুষের আধার কার্ড হয়ে গেছে। তার মধ্য দিয়ে নাগরিকদের বহু ব্যক্তিগত তথ্য, 'ডেমোগ্রাফিক ইনফরমেশন', 'বায়োমেট্রিক ইনফরমেশন' সরকার পেয়ে গেছে। ফলে সরকারের হাতে জনগণ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য রয়েছে। এর পর এনপিআর কি উদ্দেশ্যে?

প্রশ্ন ঃ কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে বলছেন, কোনও কাগজপত্র লাগবে না?

উত্তর ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মৌখিক বিবৃতির কোনও মূল্য নেই। তাঁর দপ্তরের লিখিত নিয়ম হল, নাগরিকত্বের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে, সঙ্গে দিতে হবে অবিভক্ত ভারতে বাবা অথবা মায়ের যে কোনও একজনের জন্মের সার্টিফিকেট। সেটা বাংলাদেশ থেকে আসা ক'জন শরণার্থী দিতে পারবেন? অবিভক্ত ভারতে, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের আগে জন্মের সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা আদৌ ছিল না। জন্মের সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু ১৯৭০ সালের পর। তার আগে যাঁরা জন্মেছেন, কোথায় পাবেন তাঁরা বার্থ সার্টিফিকেট?

প্রশ্ন ঃ কিছু লোক তো কাগজপত্র জোগাড় করে এই আইনের সুফল নিতে পারেন?

উত্তর ঃ আপনি কি ভাবছেন, কাগজপত্র সহ জেলাশাসকের কাছে আবেদন করলেই নাগরিকত্ব মিলবে? সরকারি কর্তৃপক্ষ আপনার কাগজপত্র যদি বৈধ মনে না করে? আপনি তো আগে এফিডেভিট করে বলেছেন, অন্য দেশ থেকে এসেছেন। নিজেকে ঘোষণা করেছেন 'বিদেশি', এদিকে নাগরিকত্বও পেলেন না ! তা হলে ঠাঁই হবে কোথায় জানেন? ডিটেনশন ক্যাম্পে অথবা সরকারি জেলে?

প্রশ্ন ঃ তা হলে, আপনারা শরণার্থীদের নাগরিকত্বের সমস্যাটির কীভাবে সমাধান চান?

উত্তর ঃ আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য, ভারতের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত পূর্বেকার আইনের ভিত্তিতেই নাগরিকত্ব দেওয়া সম্ভব। পুরনো আইনেই যে দেওয়া সম্ভব এবং মোদি সরকার তা দিয়েছে, সে বিষয়ে ১৯ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন একটি তথ্য সংবাদমাধ্যমকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গত ৬ বছরে ২,৮৩৮ জন পাকিস্তানি, ৯১৪ জন আফগান, ১৭২ জন বাংলাদেশি শরণার্থী নাগরিকত্ব পেয়েছেন। তা হলে নতুন আইনের প্রয়োজন কোথায়? ভোটার কার্ডই তো নাগরিকত্বের অন্যতম প্রমাণ। তার ভিত্তিতেই সরকার জনগণকে নাগরিকত্ব দিক। এ জন্য জনগণকে এত হয়রানির মধ্যে ফেলা কেন?

প্রশ্ন ঃ কিন্তু বিজেপি নেতারা যে বলছেন, ভোটার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়?

উত্তর ঃ এটা বিজেপি-নেতামন্ত্রীদের গা-জোয়ারি বক্তব্য। ১৯৫০ সালের নাগরিকত্ব আইন বলছে, নাগরিক মাত্রেই ভোটার। যে দুটি শর্তের ভিত্তিতে ভোটার কার্ড হয় তার একটি হল, ১৮ বছর বয়স, অন্যটি ভারতীয় নাগরিকত্ব। অমিত শাহদের বক্তব্য অনুযায়ী ভোটার কার্ডকে যদি নাগরিকত্বের প্রমাণ না ধরা হয়, তা হলে, নির্বাচিত সাংসদরা হবে অ-নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত। অতএব সাংসদরাও হবেন অবৈধ। মন্ত্রীসভা অবৈধ, সংসদ অবৈধ, তা হলে অবৈধ সংসদে পাশ করা আইন বৈধ হয় কী করে?

প্রশ্ন ঃ কিন্তু অনুপ্রবেশকারী বিতাড়ন যে জরুরি— সেটা তো মানবেন?

উত্তর ঃ অবশ্যই। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, অনুপ্রবেশ ঘটছে কী করে? কেন্দ্রীয় সরকার কি ঠিকমতো সীমান্ত সুরক্ষা করতে পারছে? বি এস এফ তো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই। গোয়েন্দা বিভাগও কেন্দ্রের হাতে। সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণও সরকার করেনি। কাঁটাতারের বেড়া বহু জায়গায় দেয়নি। প্রথম প্রয়োজন অনুপ্রবেশ আটকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারকে বাধ্য করা। দাবি তোলা দরকার, সীমান্ত সুরক্ষায় সরকারি গাফিলতি বন্ধ কর। সরকার যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়ার পরও যদি কোনও অনুপ্রবেশকারী ঢুকে যায় এবং ধরা পড়ে তা হলে আন্তর্জাতিক আইন মেনে তিনি যে দেশের নাগরিক সেই দেশের হাতে তাঁকে প্রত্যর্পণ করতে হবে। তার আগে উক্ত ব্যক্তি যে বিদেশের নাগরিক তা ভারত সরকারকেই প্রমাণ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ এনপিআর-এনআরসি-র বিরোধিতা করছেন কেন? নাগরিকদের সম্পর্কে জানার অধিকার কি সরকারের নেই?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আপনি বলুন, জনগণ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য কি সরকারের হাতে নেই? প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনার মধ্য দিয়ে নাগরিকদের সম্পর্কে তথ্য সরকার সংগ্রহ করে চলেছে। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ১২৩ কোটিরও বেশি মানুষের আধার কার্ড হয়ে গেছে। তার মধ্য দিয়ে নাগরিকদের বহু ব্যক্তিগত তথ্য, 'ডেমোগ্রাফিক ইনফরমেশন', 'বায়োমেট্রিক ইনফরমেশন' সরকার পেয়ে গেছে। ফলে সরকারের হাতে জনগণ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য রয়েছে। এর পর এনপিআর কি উদ্দেশ্যে? সরকার কি এসব তথ্য কাজে লাগিয়ে জনস্বার্থে কিছু করবে? এতে বাবা-মায়ের জন্মস্থানের উল্লেখ করতে বলা কী উদ্দেশ্যে? এর সাথে জনগণনার সম্পর্ক কোথায়? তা ছাড়া এই লিস্ট ভবিষ্যতে কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার হবে না তা কে বলতে পারে! আমরা তো ইতিমধ্যেই জেনেছি, হাজার হাজার আধার কার্ডের নথি পাচার হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ বিজেপি বলছে, 'নাগরিকত্ব (সংশোধনী) অধিনিয়ম ২০১৯-এর প্রয়োজনই হত না যদি ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ না হয়ে থাকত'। এর ফলেই শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। সেই শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিলে আপনাদের আপত্তি কেন?

উত্তর ঃ নাগরিকত্ব দেওয়া নিয়ে আপত্তি নয়। আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট বক্তব্য, সরকার যাঁদের শরণার্থী বলছে, তাঁরা ভারতেরই নাগরিক। সরকার বলুক, সে কেন এঁদের নাগরিক বলছে না? দ্বিতীয়ত, সরকার যদি সত্যিই এঁদের নাগরিকত্বের অতিরিক্ত কোনও সার্টিফিকেট দিতে চায় তা হলে সহজ প্রক্রিয়ায় দিক।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ যেমন ঐতিহাসিক ভুল, তেমনি ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব আইন করাও ঐতিহাসিক ভুল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ নিয়ে বর্তমান বিজেপি নেতাদের বক্তব্য শুনে মনে হবে যেন, বিজেপি এর বিরোধী। কিন্তু ইতিহাস বলছে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের অন্যতম উদগাতা ছিলেন বিজেপির আদর্শগত গুরু হিন্দু মহাসভার নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকার। এই মৌলবাদী নেতা ১৯২৩ সালে 'হিন্দুত্ব' নামক বইয়ে লিখেছেন, 'হিন্দু ও মুসলিম' দুটো আলাদা জাতি, তারা কখনওই একসঙ্গে থাকতে পারে না। সাভারকারের এই বিপজ্জনক চিন্তাকে মাথায় তুলে নিয়ে মুসলিম লিগ নেতা জিন্না মুসলিমদের জন্য পৃথক পাকিস্তানের দাবি তোলেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করতে এই দ্বি-জাতি তত্ত্বকে অত্যন্ত সুচতুর ভাবে কাজে লাগায়। কংগ্রেসের আপসমুখী নেতৃত্ব সরকারি গদির লোভে এই ভ্রান্ত দাবির পক্ষে দাঁড়ায়। তাছাড়া সাভারকরের দাবি অনুযায়ী ধর্ম ও জাতিকে সমার্থক করা অনৈতিহাসিক ধারণা। ইংরেজিতে ধর্ম হল রিলিজিয়ন, জাতি হল নেশন। দুটো আলাদা। হিন্দু, মুসলিম আলাদা ধর্ম। কিন্তু উভয়ই ভারতে একই জাতিসত্তার অংশ। ফলে একসঙ্গে থাকতে পারে না— এ দাবি ঠিক নয়।

শরণার্থী সমস্যার জন্য তো শরণার্থীরা দায়ী নন। এ জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও বুর্জোয়া দলগুলি এবং মৌলবাদী শক্তিগুলির উদগ্র ক্ষমতার লোভ এবং রাজনৈতিক অবস্থান। আজ স্বাধীনতার ৭০ বছর পর, ক্ষমতার স্বার্থে, হিন্দু-মুসলমান মেরুকরণ তৈরি করতে বিজেপি পুনরায় শরণার্থী সমস্যা খুঁচিয়ে তুলছে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগকে বর্তমান বিজেপি নেতৃত্ব অন্যায় মনে করলে ধর্মের ভিত্তিতে নতুন নাগরিকত্ব

ছয়ের পাতায় দেখুন

এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী ধর্না রাজ্য জুড়ে

স্বরূপনগর ঃ এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বাতিলের দাবিতে শাহিনবাগের পথে উত্তাল গোটা দেশ। এ রাজ্যেও পার্কসার্কাস, পলাশী, আসানসোল সহ নানা স্থানে চলছে লাগাতার ধর্না। ৬৬'র খাদ্য আন্দোলনের পীঠস্থান উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরও পিছিয়ে নেই। ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে বিডিও অফিসের সামনে এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির উদ্যোগে শুরু হয় আমজনতার লাগাতার ধর্না। ধর্নামঞ্চের নাম দেওয়া হয় শহিদ নুরুল ইসলাম বাগ। বিশিষ্ট নাগরিক ফজলুর হক এর সভাপতিত্বে আয়োজিত উদ্বোধনী সভায় বক্তব্য রাখেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মহিদুল ইসলাম ও বেলা পাল, সহ সভাপতি খালেক পাড়, মানবাধিকার কর্মী মোহর আলী প্রমুখ। রাত ১১-৩০টা নাগাদ ২০ জনের পুলিশবাহিনী শিবির তুলতে এলে জনপ্রতিরোধে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ধর্নার দ্বিতীয় দিনে নাগরিকদের বক্তৃতার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। ধর্নার প্রতি ছিল সকলের প্রবল সমর্থন। ৩টি বিদ্যালয়, ২টি ব্যাঙ্ক, বাজারের মধ্যে দিবারাত্র মাইকে বক্তব্য চললেও সকলে সাময়িক অসুবিধাকে মেনে নিয়ে ছিলেন। বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষার কথা বিবেচনা করে ৬ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টায় ঘোষণা করে আপাতত ধর্না স্থগিত রাখা হয়, দাবি না মানলে পরীক্ষা শেষে অনির্দিষ্টকালের জন্য তা করার আহ্বান জানানো হয়।

স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগণা

ধেড়ুয়া

ধেড়ুয়া ঃ ৮ ফেব্রুয়ারি জঙ্গলমহলের ধেড়ুয়া অঞ্চল নাগরিক কনভেনশন হয় মালবান্দী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক ডাঃ ভক্তপদ সিংহ সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা করেন শিক্ষক অক্ষয় খান, সমাজসেবী স্বপ্ন পাত্র, অধ্যাপক প্রভঞ্জন জানা, শিবশংকর মাহাত ও মেদিনীপুর শহর নাগরিক কমিটির সম্পাদক দীপক পাত্র প্রমুখ। ডাঃ ভক্তপদ সিংহকে সভাপতি, পতিত মাহাত ও রামেশ্বর মাহাতকে যুগ্ম সম্পাদক করে কমিটি গঠিত হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্ট সহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কোর্টের আইনজীবীদের এনআরসি, এনপিআর ও সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত

এআইএমএসএস-এর সংহতি ঃ এনআরসি, সিএএ, এনপিআর-এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেমে এসেছে। এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে এআইএমএসএস ৪-৫ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। তারই অঙ্গ হিসাবে ৫ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরার প্যারাডাইস চৌমুহনীর সিটি সেন্টারের সামনে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দাবি ওঠে জনগণকে বিভাজন করার ষড়যন্ত্র এনআরসি, সিএএ, এনপিআর বাতিল করতে হবে।

ছাত্রীকে গণধর্ষণ, একবালপুর থানায় বিক্ষোভ

কলকাতার একবালপুর এলাকায় সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হন। অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ডিএসও, ডিওয়াইও, এমএসএস-এর পক্ষ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি একবালপুর থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। এতে এলাকার প্রচুর মানুষ সামিল হয়ে রাস্তা অবরোধ করেন। পুলিশ অতর্কিতে আন্দোলনকারীদের উপর হামলা করে। বেশ কিছুক্ষণ পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি চলে। এলাকার মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসে পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তাঁরা বলেন, নারী নির্যাতনের সময় পুলিশ উপযুক্ত পদক্ষেপ না নিয়ে আন্দোলনকারীদের উপর কীভাবে নির্যাতন করার সাহস দেখায়! চার জনের এক প্রতিনিধি দল ওসির কাছে স্মারকলিপি দেন। এলাকায় মদের প্রসার বন্ধেরও দাবি জানান তাঁরা। স্লোগান ওঠে ধর্ষক অমরজিৎ, মনোজ, বিকাশ ও ঋত্বিককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইও-র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস, এমএসএস-এর পক্ষে কমরেড মানসী রায় এবং ডিএসও-র পক্ষে কমরেড মিথিলেশ ভক্ত। পুলিশ দোষীদের দ্রুত ও কঠোর শাস্তির আশ্বাস দেয়।

কেন্দ্রীয় কৃষি বাজেট কৃষককে ঠেলে দেবে বহুজাতিকের গ্রাসে

সুকুমার রায়ের আবোলতাবোলে মুখের সামনে লোভনীয় সুস্বাদু খাবারের টুকরো ঝুলিয়ে হাড়-জিরজিরে খুড়ো খাবারের টানে পাঁচ ঘণ্টার পথ তিন ঘণ্টায় ছোটেন। গ্রামের ঋণ-জর্জর কৃষকদের উন্নয়নে (?)-র পথে হাঁটাতে এবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রী সেই 'খুড়োর কল'-কে ব্যবহার করেছেন।

'২০২২ সালের মধ্যে সমস্ত কৃষকের আয় দ্বিগুণ হবে'— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সেই আশ্বাসবাণীর লোভ দেখিয়ে অর্থমন্ত্রী কৃষকদের উদারিকরণের পথে হাঁটানোর চেষ্টা করেছেন।

তিনি ২০১৬ সালের চাষের জমি লিজ আইন, ২০১৭ সালের কৃষিপণ্য ও গবাদি পশু বিপণণ আইন এবং ২০১৮ সালের চুক্তির ভিত্তিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন ও গবাদি পশু প্রজনন আইন—এই তিন আইনকে ব্যবহার করে রাজ্য সরকারগুলিকে উদারিকরণের অশ্বমেধ ঘোড়াকে ছোটানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বাজেট ভাষণে তিনি ১৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। এর ফলে দেশি-বিদেশি কর্পোরেটগুলি তাদের বিপুল পুঁজির সম্ভার নিয়ে গ্রামীণ ক্ষেত্রের উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিপণণের সমস্ত জায়গাজুড়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করবে। মন্ত্রীর ঘোষিত কর্মসূচিগুলি তারই পথ সুগম করবে। বিপরীতে গরিব কৃষকদের স্বার্থরক্ষার দায়বদ্ধতা থেকে সরকার বেরিয়ে আসতে চেয়েছে এই বাজেটে।

- **১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ কমেছে ৯৫০২ কোটি টাকা।**
- **সারে ভর্তুকি কমেছে ১১ শতাংশ।**

গ্রামীণ মানুষের সারা বছরের কাজ পাওয়ার সমস্যা যেখানে প্রবল, একশো দিনের কাজকে আরও ব্যাপক রূপ দিয়ে বছরে দু'শো দিন করা যায় কি না এই ভাবনা যখন করা দরকার, সেখানে এই 'রেগা' প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ ৯ হাজার ৫০২ কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হল। সারে ভর্তুকি কমানো হল ১১ শতাংশ। এর ফলে সারের দাম বাড়বে। সরকার জমিতে রাসায়নিক প্রয়োগ কমাতে বলছে। অথচ জৈব সার বা পরম্পরাগত সারের ক্ষেত্রে সরকার ব্যয়বরাদ্দ করেছে মাত্র ৬৮৭.৫ কোটি টাকা। এই টাকায় এতবড় দেশে সারের ব্যবস্থা হয়? আসলে এর মধ্য দিয়ে সারের কালোবাজারিকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের মুখে বাজেটে প্রতি কৃষি পরিবারকে বছরে ছয় হাজার টাকা সাহায্য করার 'পি এম কিষাণ প্রকল্পে ৭৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এ বছরের সংশোধিত বাজেটে দেখা গেল সেই খাতের ২১ হাজার কোটি টাকা খরচ করা গেল না এবং কৃষি ঋণ প্রকল্পে ধার্য করা দেড় লক্ষ কোটি টাকা কেবল তাদের জন্য বরাদ্দ করা হবে, যারা পিএম কিষাণ প্রকল্পে সাহায্য পেয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে ভোটে ফায়দা লোটার জন্যই এই বৈষম্য।

বাজেটে ১০০টি খরাপ্রবণ জেলাকে সোলার পাম্পের সাহায্যে সুসংহত সেচের আওতাভুক্ত করা, পতিত জমিতে সোলার বিদ্যুৎ তৈরির ব্যবস্থা করা, পচনশীল পণ্য পরিবহণের জন্য পিপিপি মডেলে 'বিশেষ ট্রেন' এবং উত্তরপূর্ব অঞ্চলের জন্য 'বিশেষ উড়ান'-এর ব্যবস্থা করা, মাছের উৎপাদন বাড়াতে 'সাগর মিত্র' নামে ৩,৪৭৭ টি মৎস্যজীবী সংগঠন তৈরি, ২০২৪-এর মধ্যে ৫০০টি কৃষি সংস্থা গড়ে তুলে এক লক্ষ কোটি টাকার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা তৈরি এই সমস্ত গালভরা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের সমস্যা নিয়ে সরকারের যে উদাসী দৃষ্টিভঙ্গি, তাতে এসব প্রতিশ্রুতির কতটুকু গরিব কৃষকদের জীবনে পরিবর্তন আনবে তাতে সন্দেহ থেকেই যায়। দেশি-বিদেশি কর্পোরেটদের পুঁজি বিনিয়েগের মৃগয়াক্ষেত্রের ব্যবস্থা করবে এই বাজেট।

এ দেশের গরিব এবং প্রান্তিক কৃষকদের সংখ্যা মোট কৃষকের ৮৬.২ শতাংশ। এই কৃষকদের মূল্য সমস্যা হল তাঁদের চাষের কাজ চালাবার মতো পুঁজি থাকে না। সার, বীজ, কীটনাশকের কালোবাজারি, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সেচের ব্যয়বৃদ্ধি, বছর বছর চাষের খরচ বাড়িয়ে তোলে। সরকারি ঋণ পাওয়ার নানা অসুবিধায় কৃষকদের চড়া সুদে মহাজনি ঋণের শরণাপন্ন হতে হয়। তারপর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি না হলে ফসল ঘরে তোলেন। কিন্তু সে ফসলের ন্যায্য দাম জোটে না। ফলে ঋণশোধের তাড়নায় জলের দরে ফসল বিক্রি করে কৃষক। তারপর পরিবারের মুখে খাবার তুলে দিতে না পারায় কিংবা ঋণের দায়ে কৃষক আত্মঘাতী হন।

বস্তুত গ্রামীণ সাধারণ কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় সরকারের কোনও ভূমিকাই নেই। সরকারের প্রচার করা প্রকল্পগুলির সুবিধা কতটুকু গরিব কৃষকদের কাছে পৌঁছায়, তা সরকারের মন্ত্রী-আমলারা ভালই জানেন। গ্রামীণ ক্ষেত্রে পুলিশ-আমলা-শাসকদলের নেতা-ফড়ে-বিদেশি পুঁজির এজেন্ট—কায়েমি স্বার্থবাদীদের এই দুষ্টচক্রই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এদের কাছে গরিব কৃষক অসহায়। এই অবস্থায় দিশাহীন এই কৃষকদের কাছে সরকারের মদতে পৌঁছে যাবে কর্পোরেটদের দালালরা। কৃষকদের সাথে চুক্তি করে তার হাতে ধরিয়ে দেবে আগাম টাকা। ফসল বিক্রির সমস্যা নেই। এজেন্টই এসে নিয়ে যাবে। কৃষক ভাববে মহাজন-ফড়েদের হাত থেকে রক্ষা পেল। কিন্তু কিছু দিন বাদেই সে বুঝতে পারবে তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে পড়েছে সে। কোন ফসল চাষ হবে, তা ঠিক হবে বিশ্ববাজারের চাহিদা অনুযায়ী। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে দায় কৃষকের। নিজের জমিতেই সে মজুরে পরিণত হবে। তাকে ছুটে বেড়াতে হবে বিশ্ববাজারের চাহিদা পূরণে।

কৃষকদের মৌলিক সমস্যা সমাধানের কোনও দিশা এই বাজেটে নেই। বরং এই বাজেট কৃষকদের উপর বহুজাতিকদের থাবাই বাড়াবে। বাজেটের মধ্য দিয়ে কৃষক স্বার্থ বিপন্ন করার প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সংগঠন সহ বিভিন্ন কৃষক সংগঠনগুলির যুক্ত সংঘর্ষ মোর্চা সর্বভারতীয় স্তরে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে।

আগামী প্রজন্মকে একটা বার্তা দিতে চাই

বলছে কলকাতার ‘শাহিনবাগ’

কলকাতার পার্ক সার্কাসে এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী ধর্নামঞ্চের নাম ‘স্বাধীনতা আন্দোলন ২.০’ মঞ্চ। স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরে এ কোন ‘স্বাধীনতা’র লড়াই! প্রশ্ন করতেই জবাব এল, আমরা এ দেশের প্রকৃত নাগরিক। তা সত্ত্বেও নতুন করে নাগরিকত্বের যে প্রমাণ দিতে বলা হচ্ছে, সেই অবমাননা থেকে মুক্তির লড়াই। ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যেয় পৌঁছতেই দেখা গেল, হাজার খানেক মহিলা অবস্থান করছেন সেখানে। বাইরে দাঁড়িয়ে আরও কয়েকশো মানুষ করতালি দিয়ে তাঁদের সমর্থন জানিয়ে চলেছেন।

এই খানেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অসুস্থ হয়ে কয়েক দিন আগে আন্দোলনকারী সাহিদা বিবি মারা গিয়েছেন। দিল্লির শাহিনবাগে চার মাসের শিশু মারা গিয়েছে। তার পরেও এত জোরদার আন্দোলন চলছে কী করে, আপনারা এত অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পাচ্ছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অবস্থানরত মহিলারা সমস্বরে বললেন, নেতাজি, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম, আসফাকউল্লা খান— এরা স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই লড়ে গিয়েছেন, আজ নাগরিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে তাঁরাই আমাদের অনুপ্রেরণা। দেশ আজ চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত, দেশের সংহতি ধ্বংসের চেষ্টা চলছে ক্রমাগত, নাগরিকত্ব নিয়ে চলছে ছিনিমিনি খেলা। এ সময় মহিলা বলে কি আমরা বাড়িতে বসে থাকব?

পঞ্চাশোর্ধ্ব আসমত জামিল আরও কিছু মহিলাকে নিয়ে শুরু করেছিলেন এই ধর্না। অসুস্থ (একটা কিডনি বাদ দিতে হয়েছে) অবস্থাতেও এক মাসেরও বেশি সময় ধরে রাত জাগছেন। ধর্নায় কেন জানতে চাইলে বললেন, এত বড় বিপদ দেশের, এ সময় বসে থাকব কী করে? আমাদের ছেলেমেয়েদের ডিগ্রি আছে কিন্তু কাজ নেই। তাদের চাকরির ব্যবস্থা কীভাবে করা যায় তাই সরকারের ভাবা উচিত। কত জন শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। সরকার তাদের শিক্ষার সুযোগ দিক। তা না করে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-ইশাই ভাগ করছে। বললেন, আমরা প্রথমে ভারতীয়, তারপর কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, শিখ-খ্রিস্টান। আমাদের মধ্যে বিভেদ করার চেষ্টা হচ্ছে কেন?

দেশের নাগরিকদের কাগজ দেখতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এতে আপত্তি কোথায়? জিজ্ঞেস করতেই ফুঁসে উঠলেন, কেন কাগজ দেখাব আমরা? যারা গরিব, সম্পত্তিহীন, তাদের অনেকের কাগজ নেই, যাদের ঘর বন্যায় ভেসে গেছে, আগুনে যাদের ঘর পুড়ে গেছে, তারা কাগজ পাবে কোথায়? তাই আমরাও কোনও কাগজ দেখাব না। ১৩০ কোটি মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাবে ওরা? যাক, কিন্তু কাগজ দেখাব না আমরা। ক্ষোভের সাথে বললেন— মোদিজিরা বলছেন, বাংলাদেশ থেকে অনেক অনুপ্রবেশকারী এ দেশে ঢুকেছে! সীমান্তে কারা পাহারা দিচ্ছে? সেনাবাহিনী। তাহলে এ দেশে অনুপ্রবেশকারী ঢুকলে তো তার জন্য সরকার দায়ী, প্রশাসন দায়ী। আর সীমান্তে পাহারা দিতে গিয়ে যে সেনারা প্রাণ দিল, তাদের নিয়ে সরকার মজা করছে, তাদের ভোটের বোড়ে হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের আহ্বান ছিল, মায়েরা যদি আন্দোলনে না নামে, তাহলে সন্তানদের চরিত্র গড়ে উঠবে না। আপনারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। এ সম্পর্কে কিছু বলুন। বললেন, আমরা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে একটা বার্তা দিতে চাই। যেখানেই অন্যায় হবে, মায়েরা প্রতিবাদ করবে, ছেলেমেয়েরা তাদের দেখে প্রতিবাদ করতে শিখবে। স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশবাসী জেগে উঠেছিল, আবারও জেগে উঠেছে এই দুঃসময়ে। বললেন, হিন্দু-মুসলিম সকলে মিলে আমরা একটা পরিবার। এটাই এ দেশের বৈশিষ্ট্য। সেই পরিবারকে কেউ ধ্বংস করতে এলে আমরা এককাট্টা হয়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলব।

সেই সময় বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে হাতে মাইক নিয়ে একটানা স্লোগান দিয়ে চলেছে — ‘ভগৎ সিং কি আজাদি’ চাহিয়ে, ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’। প্রত্যুত্তরে হাত তুলে স্লোগান দিয়ে চলেছেন আট থেকে আশি সব বয়সের কয়েকশো মানুষ।

তিলজলা থেকে আসা নুরশেদ আলম বললেন, বাচ্চাদের সন্ধ্যে ৬ থেকে ৮টা পর্যন্ত পড়াই, সে সব এখন বন্ধ। যতদিন আন্দোলন চলবে, ততদিন আসব ব্যক্তিগত ক্ষতি হলেও।

স্কুল ছাত্রী জেসকা হুসেইন অবস্থানে আসায় পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে স্বীকার করেও সাফ জবাব দিলেন, এনআরসি-সিএএ এর থেকেও বড় সমস্যা। আর ছাত্ররা প্রতিবাদে রাস্তায় নামবে না তো কারা নামবে? জেএনইউ, জামিয়া মিলিয়া আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। একদিকে মোদিজি বলছেন, ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’, কিন্তু বাঁচার জন্য আন্দোলনে নামতে হচ্ছে মেয়েদের, তাঁর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

মঞ্চে তখন দিল্লির শাহিনবাগের অভিজ্ঞতা বলছেন অমিতা বাগ। বলছেন, এই আইন চরম বেআইনি। একটা ধর্মনিরপেক্ষ নামধারী রাষ্ট্রে মানুষে-মানুষে বিভেদ ঘটানো যায় না। দিল্লিতে প্রশাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার মা-বোন যেমন রাতের পর রাত ঠাণ্ডায় খোলা রাস্তায় এনআরসি-সিএএ বাতিলের দাবিতে অবস্থান করে চলেছেন, ক্ষমতাপিপাসু কোনও রাজনৈতিক দল আন্দোলনের মঞ্চকে ভোট প্রচারের মঞ্চে পরিণত করতে পারেনি, হীন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেও এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ভাঙতে পারেনি, সেভাবেই আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। কোনও গদ্দারকে জায়গা দেবেন না। যখন তিনি বললেন, পার্ক সার্কাস পশ্চিমবঙ্গের ‘শাহিনবাগ’-এ পরিণত হয়েছে, তখন করতালিতে ফেটে পড়েছে ময়দান চত্বর। এক বাক্যে এ কথায় সায় দিলেন ভবানীপুর কলেজের ছাত্রী আসমা পারভিন। বললেন— এনআরসি, সিএএ চূড়ান্ত বিভেদমূলক, আইন বিরোধী। গণতান্ত্রিক এই রাষ্ট্রে ধর্মের ভিত্তিতে কিছু হওয়া উচিত নয়।

ধূর্ত বিজেপি এই আন্দোলনকে মুসলিমদের আন্দোলন বলে দেগে দিতে চায়। এই চক্রান্তের জবাব দিচ্ছে পার্ক সার্কাস। ধর্মীয় পরিচয় দূরে সরিয়ে পারস্পরিক বিশ্বাসে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন সরফরাজ নওয়াজ, ইমরান, গুরুবক্স সিং, রেশমা, ইসমত, ফিরোজ, শম্পা, অনুমিতা, দেবু সাউ-এর মতো স্বেচ্ছাসেবকেরা। কারও কোনও অসুবিধা যাতে না হয় তার জন্য তাঁরা সর্বদা তৎপর। ধর্নামঞ্চের সামনে অতন্দ্র প্রহরীর মতো বসে রয়েছেন আশি বছরের বৃদ্ধা। রয়েছেন দুধের শিশু কোলে মায়েরা। ক্ষমতালোভী দলগুলির নেতাদের চোখরাঙানি, পুলিশি অত্যাচারের হুমকি রয়েছে। তা উপেক্ষা করে প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর, সেন্ট জেভিয়ার্স, যোগমায়া দেবী কলেজ, মুরলীধর গার্লস কলেজ, বঙ্গবাসী, মৌলানা আজাদ কলেজের ছাত্রছাত্রী সহ পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে কয়েক হাজার মানুষের জমায়েত তখন পার্ক সার্কাস চত্বরে। মাইকে বাজছে, অত্যাচারী ব্রিটিশের ফাঁসির দড়িকে উপেক্ষা করে বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিসমিলের গাওয়া গান ‘সর ফরসি কি তামান্না আজ হামারে দিল মে হ্যায়, দেখনা কি জোর কিতনা বাজু-এ-কাতিল মে হ্যায়।’

এই ‘শাহিনবাগ’কে হঠায় কার সাধ্য! প্রতিবাদ আন্দোলনই যে মানুষকে চরিত্র দেয়, ভাল-মন্দ বুঝতে শেখায়, সচেতন করে— আবার প্রমাণ করে দিয়ে যাচ্ছে শাহিনবাগ থেকে পার্ক সার্কাস সহ এমন অসংখ্য ধর্না মঞ্চের সংগ্রামী মায়েরা।

মহৎ প্রয়াস

দিল্লির আইনজীবী ডি এস বিন্দ্রা শাহিনবাগের ধর্নায় সমবেত আন্দোলনকারীদের খাওয়ানোর জন্য এক লঙ্গরখানা খুলেছেন। তিনি ভাবতে পারেননি যে ধর্না এতদিন পর্যন্ত চলবে। ফলে অর্থে টান পড়েছে। ধর্নামঞ্চের ১০০ মিটার দূরে ফুট ওভারব্রিজের নিচে বিন্দ্রা স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে বিনামূল্যে ধর্নায় অংশগ্রহণকারীদের খাবার দিচ্ছেন। এখন অর্থে টান পড়ে যাওয়ায় তিনি ঠিক করেছেন তাঁর বসবাসের একটি ফ্ল্যাট তিনি বিক্রি করে দেবেন।

(ক্যারাভান ডেইলি ডটকম, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০)

জোড়া খুন ঃ বারুইপুর কোর্টে বিক্ষোভ

২৩ জানুয়ারি কুলতলির মেরিগঞ্জে নৃশংসভাবে খুন হন মুস্তারি বিবি ও অবিরা খাতুন। হত্যায় অভিযুক্তদের কোর্টে তোলা হয় ৬ ফেব্রুয়ারি। সিপিডিআরএস ওই দিন অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে বারুইপুর কোর্টে বিক্ষোভ দেখায়। শতাধিক গ্রামবাসীও বিক্ষোভে সামিল হন। তারা অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও মৃতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং কোনও অজুহাতেই অভিযুক্তদের জামিন না দেওয়ার দাবি জানান।

রানিগঞ্জে ইস্পাত মজদুর ইউনিয়নের সম্মেলন

২ ফেব্রুয়ারি এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের শাখা বাবা ইস্পাত মজদুর ইউনিয়নের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রানিগঞ্জে। বাবা ইস্পাত কলোনিতে মালিকের বাধাকে নস্যাৎ করে দৃঢ়তার সাথে শ্রমিকরা সম্মেলন সফলভাবে সংগঠিত করে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড সব্যসাচী গোস্বামী ও অন্যতম সহ সভাপতি কমরেড অসীম ভট্টাচার্য। সম্মেলন থেকে আগামী দিনে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য কমরেড অসীম ভট্টাচার্যকে সভাপতি এবং হিরুপদ মণ্ডল ও সঞ্জয় পণ্ডিতকে যুগ্ম সম্পাদক, মোহিব খান ও বীরেন্দ্র সিংকে সহ সম্পাদক, ভূষণপ্রসাদ যাদবকে অফিস সম্পাদক ও বিনয় সিংকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৭ জনের কমিটি নির্বাচিত করা হয়।

পাঠকের মতামত

ত্রাহি অবস্থা

দ্রব্যমূল্যের বাজার ঊর্ধ্বমুখী হয়েই চলেছে। চালের দাম ক্রমেই বাড়ছে এবং তা অতীতের সব রেকর্ড ভাঙতে চলেছে। সবজির দাম এখন গড়ে তিন থেকে চার গুণ বেড়েছে। মাছের বাজারেও পড়েছে মূল্যবৃদ্ধির কালো ছায়া। ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা ন্যায়বিচার ও মর্যাদার বিষয়ে কথা বলেন। বাস্তবে তারাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

সরকারের কাছ থেকে মানুষ যে দু'টি বিষয় প্রত্যাশা করে, তার একটি আইনশৃঙ্গলার নিয়ন্ত্রণ, অন্যটি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ। এ ব্যাপারে সরকার তাদের সাধ্যে থাকা সবকিছু করবে, জনগণ তা দেখতে চায়। কিন্তু দেশ পরিচালনায় সরকারের অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও অবহেলার কারণে দেশে ভয়াবহ খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। সব ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবন চালাতে গিয়ে বর্তমানে দেশের সৎ ও সচ্ছল মানুষেরও জীবনেও 'ত্রাহি' রব। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তার স্বল্প আয়ের কারণে যেমন সীমিত থাকে, ঠিক তেমনই জিনিসপত্রের বাজার দর দ্বারাও তা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিত্তবানদের জন্য দ্রব্যমূল্য প্রত্যক্ষভাবে কখনই তেমন একটা সমস্যা নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে আয় করে তা দিয়ে তাকে হিসাব করে জিনিসপত্র কিনতে হয়। মানুষের আয় যতটা বাড়ে, সেই তুলনায় যদি জিনিসপত্রের দাম অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি বাড়ে, তাহলেই তার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। এই ক্রয়ক্ষমতাই হল তার 'প্রকৃত আয়'। 'প্রকৃত আয়' বৃদ্ধি না পেয়ে যদি একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকে তা হলেই শুরু হয় আশাভঙ্গের যন্ত্রণা।

জনগণের প্রতি বর্তমান সরকারের আচরণ কতটা জনবান্ধব, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ সরকারের কাজ জনগণকে সুখ-শান্তিতে রাখা। জনগণের সেবক হয়ে কাজ করা। দেখা যাচ্ছে, সরকার করছে তার বিপরীত কাজ। এ পরিস্থিতিতে জনগণ কেবল হাহাকার করে জিজ্ঞেস করতে পারে, আমরা কোথায় যাব? কার কাছে যাব? সরকার কি জনগণের সুখ-দুঃখ বোঝে না? যদি নাই বোঝে, তবে তারা কার জন্য সরকার পরিচালনা করছে?

আব্দুল নাসের সিদ্দিকী
বছলা, করিমগঞ্জ, আসাম

স্বাস্থ্য বাজেট

একের পাতার পর

অর্থমন্ত্রী। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ২০,০০০ হাসপাতালকে প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার এবং ২০২৪ সালের মধ্যে দেশজুড়ে জনওষধি প্রকল্প চালু করার। প্রথমেই যে কথা বলে রাখা দরকার, এরকম 'জুমলা' (মন ভোলানো কথা) বিজেপির প্রথম নয়। ২০১৭ সালের বাজেটেও একই প্রতিশ্রুতি ছিল— প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বিনা খরচায় ওষুধপত্র দেওয়া, নিখরচায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা, সারা দেশে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার গড়ে তোলা। রয়টার্সের রিপোর্ট বলছে, যখন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রক অর্থ চাইতে গেল, অর্থমন্ত্রক তার বেশির ভাগটাই নাকচ করে দিল। ফলে জুমলা ফাঁস। এ বছরেও যে তার অন্যথা হবে না, সে কথা হাঁড়ির হাল দেখলেই বোঝা যায়। তা হলে ক্ষয়রোগ নির্মূল হবে কী করে?

সরকার বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করেছে, দেশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির শহরগুলিতে এই হাসপাতালগুলি গড়ে তোলা হবে। খুব ভাল কথা। দ্বিতীয় সারির শহর কোনগুলি? বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, কটকের মতো ১০৪টি শহর। তৃতীয় সারির থেকে একটু পিছিয়ে থাকা শহরগুলি। এই শহরগুলির কোথায় হাসপাতাল নেই? বরং দেশের নামকরা হাসপাতালগুলোর বেশিরভাগ এই দ্বিতীয় সারির শহরগুলোতেই। তা হলে তেলা মাথায়তেল দিয়ে দেশের প্রান্তিক মানুষের কি কোনও উপকার হবে?

তৃতীয়ত, সরকার বলছে সাধ আর সাধ্যের ফারাক মেটাতে তারা বরাত দেবে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে (Viability Gap Funding), হাসপাতাল গড়ে উঠবে পিপিপি মডেলে। এই হাসপাতালগুলোতে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসা পাবে সাধারণ মানুষ। তার অর্থ কী? জনগণের থেকে আদায় করা ট্যাক্সের ছ'হাজার কোটি টাকা কৌশলে হাসপাতাল তৈরির জন্য তুলেদেওয়া হবে বেসরকারি মালিকদের হাতে। তারপর স্বাস্থ্য বিমার বরাদ্দ টাকা আর একবার গিয়ে ঢুকবে তাদের পকেটে। সার্বিক বিমা নির্ভর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই পরিকল্পনাই তারা তৈরি করেছিল 'স্বাস্থ্য নীতি ২০১৭' মারফত। বর্তমান বাজেট সেটাই প্রয়োগ করার ব্যাপারে এক ধাপ এগিয়ে গেল। ফলে 'আয়ুষ্মান ভারত'কে বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যপ্রকল্প বলে যতই ঢাকঢোল পেটাক, আসলে এটা হল সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা জনগণকে ধোঁকা দিয়ে বেসরকারি মালিকের পকেটে তুলে দেবার বৃহত্তম প্রকল্প। তাদের পকেট আরও মোটা করতেই চলতি মাস থেকেই চিকিৎসা সরঞ্জামের উপর সেস বসাচ্ছে সরকার। তাহলে বলুন, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা যাদের উদ্দেশ্য তারা চিকিৎসা পরিষেবার কোন উন্নতি করবে? সর্বোপরি অতি সাধারণ রোগে ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ পায় না যে জনগণ, যাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে রোগ নিরাময়ে আজও গোমূত্র পানের দাওয়াই বাতলায় বিজেপি-আরএসএস নেতারা, শহরকেন্দ্রিক হাসপাতালগুলি তাদের কোন স্বার্থ রক্ষা করবে?

আবার ধরা যাক 'ব্রিজকোর্স'-এর প্রস্তাবটি। চিকিৎসকের সংখ্যার অপ্রতুলতাকে অজুহাত করে গ্রামীণ জনসাধারণ এবং গরিব মানুষদের জন্য অল্প দিন প্রশিক্ষণ দেওয়া আধসেঁকা ডাক্তার তৈরির অমানবিক পরিকল্পনা তাদের অনেক দিনের। সম্প্রতি ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন বিলেও উত্থাপিত এই প্রস্তাব আন্দোলনের চাপে নাকচ হয়ে যায়। এখন স্বাস্থ্যকর্মীদের স্কিল ডেভলপমেন্ট খাতে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে সেই একই জিনিস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে। এর জন্য জেলা হাসপাতালগুলিকে মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যুক্ত করে পিপিপি মডেলে পরিকাঠামো তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। এতবার নাকচ হবার পরেও একই জিনিস চালুর জেদকেন? উদ্দেশ্য একটাই— স্বাস্থ্য শিক্ষার বেসরকারিকরণ করে পুরো স্বাস্থ্যক্ষেত্রটা মুনাফাখোরদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করা। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্র সরকারের অনুদানে চলা বিশেষ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন দিল্লির এইমস, সফদরজং, আর এম এল, পিজিআই চন্ডীগড়, কেরালাতে নিমহানস, ইম্ফলে রিমস, শিলং-এর নেগ্রিমস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ সংকোচন করেছে বর্তমান বাজেট। মূল্যবৃদ্ধির বাজারে যেখানে বরাদ্দ আরও বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল সেখানে এই বরাদ্দ সংকোচনের ফল কী হতে পারে? হয় মানের ব্যাপারে আপস, নয় অবধারিতভাবে তার ব্যয়ভার বর্তাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসা পাওয়া সাধারণ মানুষ এবং পড়াশোনা করা ছাত্রছাত্রীর উপর। তাহলে জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা হচ্ছে কোথায়?

সর্বোপরি একথা বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত যে টিউবারকুলোসিসের মতো মারণ ব্যাধির উৎস দারিদ্র, অনাহার, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান। কোনও দেবতার অভিশাপ কিংবা কপাল নয়। এর প্রতিরোধ করতে গেলে প্রান্তিক স্তর পর্যন্ত গড়ে তুলতে হয় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, বজরংবলী মন্দির গড়ে যা হয় না। এ ব্যাপারে সরকারের স্লোগানই ভরসা! ফান্ড এবং সঠিক পরিকল্পনা কোথায়! পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আজ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে কি উন্নত কি অনুন্নত কোনও পুঁজিবাদী দেশেই শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষ জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা পায় না। এ দেশের বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সেই শোষণ-নিপীড়নকেই আরও মারাত্মক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং ফ্যাসিস্ট কায়দায় এ দেশের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থরক্ষার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। চলতি অর্থবর্ষের বাজেট তারই প্রতিফলন। এই বাজেটে জনগণের ন্যূনতম অর্থনৈতিক সুরক্ষা দেবার প্রতিশ্রুতি নেই, ক্রমবর্ধমান মারাত্মক বেকার সমস্যা সমাধানের কোনও পথ দেখাতে পারেনি, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সুরাহা করেনি, সাধারণ মানুষের জন্য, গ্রামীণ গরিব মানুষের জন্য ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা বলেনি, স্বাস্থ্য পরিষেবা গঠনের রূপরেখা তুলে ধরেনি। তাহলে 'টিবি হারেগা, দেশ জিতেগা' বলে দিবাস্বপ্ন দেখানোর অর্থ কি? বিগত ছয় বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিজেপি যে সব জুমলা প্রচার করছে, এটাও তাই। এবারের বাজেট যদি কারও ক্ষয় প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরতে চেষ্টা করে, সেটা এ দেশের মুমূর্ষু একচেটিয়া পুঁজির। জনগণকে মারাত্মক ক্ষয়রোগ থেকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি নয়।

বিজেপির প্রচার সঠিক নয়

তিনের পাতার পর

আইন সিএএ আনল কেন? একটা অন্যায়ের প্রতিকার কি আরেকটা অন্যায় হতে পারে?

১৯৫০ সালের যে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির কথা বিজেপি বলছে, তাতেও বলা হয়েছে, ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা। ফলে বিজেপির বর্তমান অবস্থান নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বিপরীত। পাকিস্তান নেহরু-লিয়াকত চুক্তি অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেনি। একইভাবে ভারতেও বিজেপি শাসনে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার বহু ঘটনা ঘটছে। দুই দেশের এই ঘটনাক্রম দেখাচ্ছে, উভয় দেশের বুর্জোয়া সরকার জনগণের ঐক্য ধ্বংস করতে ধর্মীয় বিভাজনকে কাজে লাগিয়েছে। বুর্জোয়া সরকার জনজীবনের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ। এই দিক থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে এই ধর্মীয় বিভাজনকে কাজে লাগাচ্ছে। পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার পিছনে বা ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার পিছনে সংশ্লিষ্ট মৌলবাদীরাই শুধু দায়ী নয়, দায়ী শাসক বুর্জোয়া শ্রেণিও। এই বিষয়টি ভুক্তভোগী জনসাধারণকে মনে রাখতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের আপত্তির আর কী কারণ আছে?

উত্তর ঃ আমাদের আপত্তির অন্যতম বড় কারণ হল গরিব মানুষ সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বেন। এ দেশের একটা বিরাট অংশের মানুষ যাঁদের কোনও নিজস্ব জমি নেই, বাড়ি, সম্পত্তি নেই। নেই কোনও ডকুমেন্ট বা নথি। যাঁরা জনজাতি, আদিবাসী, ভূমিহীন খেতমজুর, যাঁরা-নিরক্ষর, পেটের টানে যারা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে এখানে ওখানে কাজ করতে বাধ্য হন, তাঁরা কোথায় পাবেন ডকুমেন্ট? পুঁজিবাদী শোষণে, সরকারের জনবিরোধী শাসনে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সবকিছু হারিয়েছেন যাঁরা, তাঁরা কী ডকুমেন্ট দেবেন? রেশনকার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাঙ্কের বই, জমির দলিল ইত্যাদি নাগরিক পরিচিতির প্রামাণ্য নথি সরকার খেয়ালখুশি মতো অস্বীকার করলে জনগণের হাতে আর কী থাকে দেওয়ার? সেজন্যই আমরা বলছি গরিব মানুষদের বিরুদ্ধে সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আইন তো পাশ হয়ে গেছে।

উত্তর ঃ তাতে কি হয়েছে? জনগণ তো গ্রহণ করেননি। আইন জনস্বার্থে না হলে, মানুষ আন্দোলন করেই আইন পাল্টাবে। ইতিহাস এই সত্য প্রমাণ করেছে। আইনের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য আইন—ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে এ কথা বলেছিলেন ভগৎ সিং। সিএএ নামক যে আইন জনগণের গলায় আজ ফাঁস হয়ে বসতে চাইছে সেই আইন সরকার দ্রুত না পাল্টালে মানুষ জীবন দিয়ে তা রুখবেই।

প্রশ্ন ঃ এত বড় একটা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে এ লড়াই কত দিন চলতে পারে?

উত্তর ঃ কতদিন চলবে তা নির্ভর করবে সরকারের মনোভাবের উপর। সরকার জনগণের দাবির প্রতি মূল্য দিয়ে সিএএ প্রত্যাহার করতে যত বেশি সময় নেবে, আন্দোলনও তত দীর্ঘস্থায়ী হবে। সংগঠিত রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনগণকেও সঠিক পথে সংগঠিত হতে হবে।

প্রশ্ন ঃ একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে, তা হল সরকারের প্রতি জনগণের বিশ্বাসহীনতা। এর কারণ কী?

উত্তর ঃ এর মূলে আসাম এনআরসি। আসামে হিন্দুর ত্রাতা সেজে, উগ্র মুসলিম বিরোধী জিগির তুলে, উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তির সঙ্গে জোট করে ক্ষমতাসীন হয়েছে বিজেপি। তার পরেই যে এনআরসি তালিকা তৈরি হয়েছে তাতে দেখা যায় ১৯ লক্ষের বেশি ভারতীয় নাগরিকের নাম বাদ গেছে, যার মধ্যে ১৬ লক্ষাধিকই হিন্দু। এতে শুধু আসামের মানুষই নন, সারা দেশের মানুষই বুঝে যান, হিন্দুর স্বার্থরক্ষা বিজেপির কাছে একটা রাজনৈতিক স্লোগান মাত্র। তার লক্ষ্য ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনে সংখ্যাগুরুর ভোট কব্জা করে ভোটে জয়। আর সংখ্যালঘুদের ভয় দেখিয়ে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা। কিন্তু তাতে সাধারণ হিন্দুর কী স্বার্থ রয়েছে? অর্থনৈতিক কোনও সংকটই সে সমাধান করতে পারেনি। মানুষ এই সরকারের প্রতি আস্থা রাখবে কী করে? সরকার অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প কোনও বিষয়েই প্রতিশ্রুতি রাখেনি এবং অসত্য ভাষণ করেই চলেছে। কী করে মানুষ বিশ্বাস করবে? ফলে এ লড়াই অনিবার্য। ইতিমধ্যে নৈতিকভাবে এই সরকারের পরাজয় ঘটে গেছে। ওদের অসৎ উদ্দেশ্য ইতিমধ্যেই উদঘাটিত।। ওদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে নির্মূল করতে হলে সমাজ মনন থেকে সাম্প্রদায়িক চিন্তার অবশেষ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শগত সংগ্রাম তীব্র করা জরুরি।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(২৯)

বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়

আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার সংস্কার করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সেই অনুভূতিরই যুগান্তকারী ফসল 'বর্ণপরিচয়'। ১৮৫৫ সালের এপ্রিলে 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রথম ভাগ এবং জুনে দ্বিতীয় ভাগ

তিনি প্রকাশ করেন। 'বর্ণপরিচয়'-এর আগে 'লিপিধারা' (১৮১৫), 'জ্ঞানারুণোদয়' (১৮২০) 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২১), 'বঙ্গবর্ণমালা' (১৮৩৫), দু'ভাগে 'শিশুশিক্ষা' (১৮৪৯, '৫০), দু'ভাগে 'বর্ণমালা' (১৮৫৩, '৫৪), তিন ভাগে 'শিশুসেবধি' (১৮৫৪) ইত্যাদি বইগুলি ছিল। তা সত্ত্বেও 'বর্ণপরিচয়'- লেখবার কথা কেন মনে করলেন বিদ্যাসাগর? বস্তুত, তাঁর এই মানসিকতার মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্কতার ছাপ। 'বর্ণপরিচয়'-এর দ্বারা বাংলা ভাষাকে তিনি সংস্কৃতের অহেতুক শাসনজাল থেকে মুক্ত করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়েছিলেন।

'বর্ণপরিচয়'-এর আগে প্রকাশিত বইগুলি শিশুদের ক্ষেত্রে যথার্থ অর্থে উপযুক্ত ছিল না। কারণ, বইগুলি শুধু বর্ণশিক্ষার জন্য ছিল না। বইগুলির শিক্ষণপদ্ধতি ছিল জটিল এবং সেগুলির মধ্যে আরও নানা বিষয় যুক্ত ছিল, যা প্রাথমিক শিক্ষার্থীর কাছে ছিল বাধাস্বরূপ। যেমন, 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' বইটিতে বর্ণমালা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি সব মিলিয়ে বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮৮। একটা শিশুর হাতে শিক্ষাজীবনের শুরুতেই এত মোটা বই ধরানো কোনও ভাবেই বাঞ্ছিত নয়।

দ্বিতীয়ত, ওই সমস্ত বইগুলিতেই বর্ণের সংখ্যা অহেতুক বেশি ছিল। এটি সংস্কৃত ভাষার নেতিবাচক প্রভাব বলেই মনে করা হয়। কিন্তু 'বর্ণপরিচয়'-এর আগে কেউই সে প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। লেখাই বাহুল্য, এটা তাঁদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার ব্যাপার ছিল না। ব্যাপারটা ছিল নতুন দৃষ্টিভঙ্গির। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সমাজ কীভাবে যুক্ত, তার ক্ষুরধার উপলব্ধির প্রশ্ন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই, বর্ণশিক্ষাকে সঠিক খাতে তরান্বিত করতে বিদ্যাসাগরই প্রথম অপ্রয়োজনীয় বর্ণগুলিকে বাদ দেন। স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সারণি সংস্কার করেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "বহুকাল অবধি বর্ণমালা ষোলো স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষায় দীর্ঘ ঋ-কার এবং দীর্ঘ লি-কারের প্রয়োগ নেই। এই নিমিত্ত এই দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনুস্বরও স্বরবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এজন্য ওই দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। ...ক ও ষ মিলিয়া 'ক্ষ' হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ; এ জন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

তৃতীয়ত, শিশুদের বাংলা বর্ণের সাথে পরিচয় ঘটানোর ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। যেমন, তিনি একই ধরনের বর্ণগুলিকে একসঙ্গে লিখতে শেখানোর উপর জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ, 'ব'-এর সঙ্গে আকারগত মিল আছে 'র, ক, ধ, ঋ-এর। আবার ড় ঢ় ঙ ভ ত বা ঢ ঢ় ট'— এগুলোর মধ্যেও আকারগত মিল আছে। বলেছেন, এগুলো একসঙ্গে শেখালে শিশুরা দ্রুত তা আয়ত্ত করবে। 'বর্ণপরিচয়'-এর শব্দ তিনি বেছেছেন শিশুর পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার গণ্ডি থেকে। সেখানে তৎসম শব্দের ব্যবহার যথাসম্ভব কম করেছেন। বিদ্যাসাগরের বেছে নেওয়া শব্দসমষ্টির মধ্যে একটা ছন্দও খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন 'অচল, অধম' বা 'ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য'। শব্দ থেকে যখন ছোট ছোট বাক্যের জগতে শিশু পা ফেলছে, সেখানেও এই ছন্দোবদ্ধতা দেখা যাবে। যেমন—

পথ ছাড় জল খাও /হাত ধর বাড়ি যাও
জল পড়ে মেঘ ডাকে/ হাত নাড়ে খেলা করে

এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য, যেখানে তিনি বলেছেন, "কেবল মনে পড়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবে কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এটাই আদি কবির প্রথম কবিতা।"

শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক, উভয়ের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেও যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল সেটা বোঝা যায় 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগে, শিক্ষকদের উদ্দেশে তাঁর নির্দেশিকা থেকে। সেখানে তিনি বলছেন, "সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা উহার বর্ণ বিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না।"

বস্তুত, বর্ণপরিচয়ে শিশু মনের উপযোগী করে শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, বিষয়বস্তু উপস্থাপনা, ভাষার ব্যঞ্জনা— সর্বক্ষেত্রেই তিনি গভীর বিজ্ঞানমনস্কতার ছাপ রেখেছেন। বিবেকানন্দের একসময় আক্ষেপ ছিল, বাংলা ভাষায় শিশুমনের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক নেই। সেই বিবেকানন্দই পরে বর্ণপরিচয় সম্পর্কে বলেছেন, "শিশুমনের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা অনুভব করে তাকে ধাপে ধাপে ভাষা শেখাবার চমৎকার ব্যবস্থা। বিদ্যেসাগর মশায়ের মতো পাকা শিক্ষকেরই উপযুক্ত কাজ। ভাষা শিক্ষানবীশদের জ্ঞানের স্তরভেদ, বর্ণ ও বাক্যবিন্যাস— যথাযথ এর মধ্যে করা হয়েছে।" কার্যত, 'বর্ণপরিচয়'-এ বিদ্যাসাগর বিশেষত ছেদ-যতি চিহ্নের সুন্দর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, যা ভাব ও ভাষাকে অত্যন্ত সুষমামণ্ডিত করেছে।

'বর্ণপরিচয়'-এর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করে দেওয়া। তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, দয়ামায়া, মানুষের প্রতি ভালবাসা, জাগিয়ে তোলা। 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগের রাখাল, গোপাল, ভুবনদের কথা আজও আমাদের মনে দাগ কেটে আছে। ভুবনের বেদনাদায়ক পরিণতি আজও আমাদের মনে ব্যথা জাগায়। এর মধ্যে রয়েছে সেই মূল্যবোধ যা শিক্ষার্থীকে যথার্থ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে শেখায়। এর পিছনে রয়েছে তাঁর সেই পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তা যার মূল কথা হল— 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। বোধোদয়, জীবনচরিতের মতো তাঁর অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকেও এটা তিনি করেছেন বড় মানুষদের জীবনীর সাহায্যে। দেখাতে চেয়েছেন— মানুষ ভবিষ্যতে কী হবে, সেটা তার কপালে লেখা থাকে না। তা নির্ভর করে তার জীবন সংগ্রামের উপর।

এই সব কিছুর সাথে 'বর্ণপরিচয়'-এর মধ্যে সবচেয়ে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, এই বইতে বিদ্যাসাগর কোথাও কোনও ধর্মীয় অনুষঙ্গ টানেননি। কাহিনীর সঙ্গে ধর্ম বা ধর্মীয় সংস্কারের কোনও সংস্রব নেই। 'বর্ণপরিচয়' সহ অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সচেতনভাবে অপার্থিব চিন্তা বাদ দিয়েছেন। কোথাও লেখেননি— মিথ্যা বলা পাপ। 'পাপ-পুণ্যের' ধর্মীয় ধারণা তিনি নতুন যুগের নতুন প্রয়োজনের নিরিখেই আনেননি। তিনি লিখেছেন— মিথ্যা বলা বড় দোষ। যে মিথ্যা কথা বলে কেহ তাহাকে ভালবাসে না।

প্রায় সমস্ত আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকরা স্বীকার করেন, বর্ণপরিচয়ের প্রভাব ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলিকেও তাদের ভাষাগত বনিয়াদ গড়ে তুলতে সহায়তা করছে। এটা ছিল ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন দিশারি। আধুনিক শিক্ষাচিন্তার আধারের উপর দাঁড়িয়ে ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক ধাপটি কেমন হবে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' তারই হদিশ দিয়েছে। তার সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশেষত বাংলা গদ্যের তিনি নবনির্মাণ করে গেছেন। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "বাঙ্গালা গদ্যের অন্তর্নিহিত ঝংকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এখনকার দিনে অসম্ভব নয়। কিন্তু যখন ভালো গদ্যের নমুনা কদাচিৎ দেখা যাইত, সেইকালে বিদ্যাসাগর যে কী অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে বাঙ্গালা গদ্যের সেই অন্তর্নিহিত ঝংকারের সম্ভাবনা বা অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। অর্থাৎ গদ্য রচনার ছন্দবিষয়ে তিনিই ছিলেন প্রথম দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। গদ্যপাঠের ধ্বনি-সামঞ্জস্যে যে পাঠক ও শ্রোতা আনন্দ পাইতে পারে, এই সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁহার ছিল।" (চলবে)

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড নিতাই সিংহ ২৭ জানুয়ারি দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন বিড়ি প্যাকার। ১৯৮২ সালে প্যাকারদের বোনাসের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন হয় এবং দাবিও আদায় হয়। এই সময় কমরেড নিতাই সিংহ দলের বৈপ্লবিক চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং ধীরে ধীরে কর্মীতে পরিণত হন। দলের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আনুগত্য। অসুস্থ অবস্থাতেও লোকাল অফিসে এসে নিজের চাঁদাপত্র দিয়ে যেতেন।

কমরেড নিতাই সিংহের মরদেহ লোকাল অফিসে এসে পৌঁছলে দলের জেলা সম্পাদকের পক্ষে কমরেড সাবির আলি এবং লোকাল সম্পাদক ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সামিরুদ্দিন সহ অন্যান্য কমরেড ও স্থানীয় মানুষ তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড নিতাই সিংহ লাল সেলাম

অনুপ্রবেশ

দুয়ের পাতার পর

দেশগুলি থেকে এখন তো দলে দলে মানুষ ইউরোপের দেশগুলিতে ঢুকছে। ভারত বাংলাদেশ সহ এশিয়ার দেশগুলি থেকে বহু মানুষ বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে ইংল্যান্ডে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে গিয়ে বসবাস করছে। কোথাও সেখানকার অধিবাসীরা এ নিয়ে এমন গেল গেল রব তোলেনি। একমাত্র কিছু উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিই এ নিয়ে হইচই করছে। ঠিক যেমন এখানে বিজেপি করছে। বরং সেখানকার সাধারণ মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই সব আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দিতে সরকারকে বাধ্য করছে।

বাংলাভাষী মাত্রেই মিথ্যা প্রচারের শিকার

বিজেপির মিথ্যা প্রচারে দেশের কিছু সংখ্যক হলেও, এ রাজ্যের এমনকি একটা শিক্ষিত অংশও খানিকটা বিশ্বাস করে ফেলছেন। তাঁরা এর আর একটা মারাত্মক দিক খেয়াল করছেন না। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবাংলা উভয়েরই ভাষা বাংলা। অনুপ্রবেশকারীরা বাংলাভাষী— এই প্রচারে বিশ্বাস করে বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী মাত্রেই অনুপ্রবেশকারী এমন সিদ্ধান্ত এমনকি প্রশাসনে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। বেঙ্গালুরুতে পশ্চিমবাংলা থেকে কাজের জন্য যাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের বাসস্থান কোনও বাছবিচার না করে ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাঁদের রীতিমতো অপদস্থ করা হয়েছে। তদন্তে দেখা গেছে, এমনকি প্রশাসনিক কোনও নির্দেশ ছাড়াই পুলিশ এ কাজ করেছে। দেশের রাজধানী দিল্লিতে পর্যন্ত এ রাজ্যের মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে। শুধু শ্রমজীবী মানুষেরাই নয়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-অধ্যাপক এবং অন্য ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষদেরও এই প্রচারের শিকার হতে হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে এ রাজ্য থেকে কাজ করতে যাওয়া মানুষদের নানা ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে দেশের এক স্থানের যে কোনও মানুষের অপর যে কোনও অংশে বসবাস করার অধিকার রয়েছে। বিজেপির এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার সেই স্বাভাবিক অধিকারকেও কেড়ে নিচ্ছে।

এই অবস্থায় অনুপ্রবেশ নিয়ে বিজেপির সর্বনাশা রাজনীতিটি আজ সকলকেই বুঝতে হবে। কারণ এটি এমন একটি ইস্যু যা দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে জনসাধারণের শোষণমুক্তির আন্দোলনে প্রভূত পরিমাণে ক্ষতি করবে এবং শাসক শ্রেণির হাতকেই শক্তিশালী করবে। তাই অত্যন্ত খোলা মন নিয়ে বিষয়টিকে বিচার করতে হবে এবং বিজেপি নেতাদের মিথ্যার মুখোশকে খুলে দিতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

‘বুঝলাম লড়াইয়েই প্রকৃত আনন্দ’

৭ ফেব্রুয়ারি, কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে স্থাপিত হয়েছে ‘মাইল স্টোন’, সাথে বিদ্যাসাগরের কাটআউট। সেই দৃঢ় পদক্ষেপের ছবির সামনে থমকে দাঁড়াচ্ছেন মানুষ। সেই ‘অজেয় পৌরুষ’, ‘অক্ষয় মনুষ্যত্ব’ সাধনার অনুশীলনের অঙ্গীকার, তাঁর চলার পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে সুদূর শিলিগুড়ি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ‘অঙ্গীকার যাত্রী’রা রওনা হয়েছেন। আরও একদল ৪ ফেব্রুয়ারি বীরসিংহের পবিত্র মাটি ছুঁয়ে শুরু করেছেন হাঁটা। আর একদল আসছেন বিদ্যাসাগরের কর্মভূমি কর্মাটাঁড় থেকে। ৭ ফেব্রুয়ারি সকলেই এসে মিলিত হলেন কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে।

বিদ্যাসাগর মূর্তির দু-পাশে রেলিং জুড়ে প্রদর্শনী। একদিকে বিদ্যাসাগরের মূল্যবান উদ্ধৃতি। অন্যদিকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অন্যান্য মনীষীদের উক্তি। এই মানুষটিকে চেনা যে আজ অত্যন্ত জরুরি। ভারতীয় সমাজ-সভ্যতাকে মেকি জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে যেভাবে পিছন দিকে ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে তার বিরুদ্ধেপ্রগতির সংগ্রামে আজও তিনি পথ দেখান।

সমবেত হয়েছেন রাজ্যের নানা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার কিলোমিটার পথের মাঝে মাঝেই অঙ্গীকার যাত্রীদের সংবর্ধনা জানিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। হুগলির

কলেজ স্কোয়ারে সমাপনী সভায় অঙ্গীকার গ্রহণ করছেন ডিএসও-র নেতা-কর্মীরা

দামোদরপুরে ছাত্রীরা পুষ্পবৃষ্টি করেছেন মিছিলের উপর। জনতার বিপুল অভ্যর্থনায়, নানা রঙের ফুল-মালায় ভরে উঠছে গোটা মিছিল। বিমুগ্ধবিস্ময়ে মানুষ একটাই কথা বলেছেন, ‘যারা বিদ্যাসাগরকে সঠিকভাবে চিনতে চায় সেই ছাত্রছাত্রীরাই তো অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে। যুগে যুগে অন্যায়-শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে ছাত্ররাই তো সমাজকে জাগায়।’

এমনই অভিজ্ঞতা হয়েছে বিদ্যাসাগরের অন্যতম কর্মস্থল ঝাড়খণ্ডের কর্মাটাঁড়েও। সাম্প্রদায়িক শক্তি আরএসএস-বিজেপি’র তীব্র বাধার মধ্যেই স্থানীয় জনসাধারণের গভীর ভালবাসা ও সমর্থনে ‘নন্দনকানন’-এ বিদ্যাসাগর-মূর্তিতে মাল্যদান, তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে কর্মাটাঁড় থেকে কলকাতা পর্যন্ত ‘অঙ্গীকার যাত্রা’র সূচনা হয়েছিল। আরএসএসের নিষেধ সত্ত্বেও ‘নন্দনকানন’-এর কেয়ারটেকার, স্থানীয় যুবক জিতেন্দ্র, তাঁর স্কুলপড়ুয়া সন্তানকে নিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ছাত্রদের তিনি বলেন, “বিদ্যাসাগরের নামে অনেক অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু আপনারা যে কথাগুলো বলছেন, যে আন্তরিকতা নিয়ে কিছু করার চেষ্টা করছেন, এমন কখনও দেখিনি।”

‘অঙ্গীকার যাত্রা’ যখন আসানসোল শহরে ঢুকেছে সেখানকার এনআরসি-সিএএ বিরোধী লাগাতার অবস্থান আন্দোলনকারীরা ছাত্রদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, “আপনারাই সত্যিকার ভারতের রূপ তুলে ধরছেন।” বীরসিংহে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের পরিচালক অভিভূত হয়েছেন সমগ্র কর্মসূচিতে।

সাত দিন ধরে প্রায় এক হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে ‘অঙ্গীকার যাত্রা’ যখন কলেজ স্কোয়ারে ঢুকছে, সে এক অসাধারণ অনুভূতি। বিদ্যাসাগরের পূর্ণাবয়ব ছবি বহন করে ড্রামের তালে তালে এগিয়ে আসছে অঙ্গীকার যাত্রীর দল। দু-পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। পথ চলার ক্লান্তি ছাপিয়ে আশ্চর্য এক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত অগণিত তরুণ-তরুণী। এ গুরু দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার নিচ্ছে যারা তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিবাদন তাঁদের দৃষ্টিতে। পতপত করে উড়ছে সাদা ধবধবে নিশান, সেখানেও বিদ্যাসাগর। রাস্তার দু’ধারে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র টকটকে লাল পতাকা।

—এত দীর্ঘ এবং কঠিন কর্মসূচি কী জন্য?

উত্তর দিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার ছাত্র সঞ্জিত দেবনাথ, “না এসে পারলাম না। বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন পূরণের কাজে যতটা পারি অংশ নিতে চাই।”

কোচবিহার ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের ছাত্রী চন্দনা ভুঁইমালীর মুখে হাসি, “আমি সেই শিলিগুড়ি থেকে টানা সাত দিন মিছিলে আছি। কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হয়নি।” বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রাহুল শতপথী, সুদীপ পাইনরা দেশজুড়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিলেবাস দেখে নীরব থাকতে পারেননি, বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন পূরণের কথা ভেবেছেন। হলদিয়া সিআইপিইটি-র ছাত্র জিৎ চট্টরাজের জোর ‘মানুষ হওয়ায়’। আধুনিক মানুষ— বিদ্যাসাগর যেমন মানুষ চেয়েছিলেন তেমন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রায়দিঘি কলেজে বাংলা বিভাগের ছাত্রী রিয়া হালদারের সংযোজন, “শুধু মানুষ হওয়া নয়, মনুষ্যত্ব রক্ষারও অঙ্গীকার।”

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের ছাত্র রাজেন্দ্র মণ্ডলের স্পষ্ট উচ্চারণ, ‘বিদ্যাসাগর ধর্মনিরপেক্ষ জীবনধারাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ দেশে ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের নামে মানুষকে আলাদা করার ষড়যন্ত্র চলছে। এর বিরুদ্ধেও আমাদের লড়াই।” দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সায়ন হালদার চায় প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল। নিয়েছে লড়াইয়ের অঙ্গীকার। রানাঘাট কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র সুরজিৎ সরকার শিলিগুড়ি থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত পাঁচ দিন টানা মিছিলে হেঁটেছে। চেয়েছে বিদ্যাসাগরের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার আদর্শে এনআরসি-সিএএ বিরোধী সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের সুস্মিতা জোয়ারদারের অঙ্গীকার— ‘বিদ্যাসাগর নারীর অবমাননার বিরুদ্ধে আজীবন লড়েছেন। কত অপবাদ, নিন্দা সহ্য করেছেন। তাঁর মূর্তির নিচে দাঁড়িয়ে আমরা অঙ্গীকার করছি, নারী নির্যাতন চলতে দেব না।’ সুস্মিতার পাশে তখন বাঁকুড়ার প্যারা-মেডিক্যাল ছাত্রী নিবেদিতা রায়। ওরা কেউ একা নয়। কলকাতার সেন্ট পলস স্কুলের দশম শ্রেণির বর্ষণ দাশগুপ্ত, সৌগত গায়েনরা এসেছে। সিএমও, মহম্মদ জান, এমএল জুবিলি সহ বহু উর্দুমাধ্যম স্কুলের ছাত্ররা এসেছে। তারা শিক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি জানছে বিদ্যাসাগরকে। সোনারপুরে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র অনিমেষ সাঁই এত ছাত্র-ছাত্রীর সান্নিধ্যে শক্তি পায় আগামী দিনের পথ চলার। মুরলীধর গার্লস কলেজের সিমরন নিশার বলে ওঠেন “আমাদের এত বন্ধু আছে আগে জানতাম না।”

পশ্চিম মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিপুল জানা সাত দিনই মিছিলে ছিল। দেখেছে মায়েরা কীভাবে মেয়েদের নিয়ে এসেছেন মিছিলে। তার অনুভূতি ‘দলে দলে মানুষ আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছে, জীবনে কোনও দিন ভুলব না। বুঝলাম লড়াইয়েই প্রকৃত আনন্দ। তাই, লড়াই ছাড়ব না।’ কেন এই ‘অঙ্গীকার যাত্রা’, কীসের বিরুদ্ধে লড়াই, কোন আদর্শের ভিত্তিতে লড়াই সে কথা তুলে ধরলেন এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। সমবেত সকলকে অভিনন্দন জানালেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সামসুল আলম।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসও-র সর্বভারতীয় সভাপতি ডিএনআর শেখর, সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ। প্রধান অতিথি ছিলেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ। তিনি বলেন, “তোমরা ছাত্রছাত্রীরাই সমাজের ভবিষ্যৎ। সত্যকে ভিত্তি করে উন্নত মনুষ্যত্ব অর্জনের মধ্য দিয়েই নতুন সমাজ তোমরা গড়ে তুলবে। তাই, অঙ্গীকার তোমাদের একদিনের নয়, আজীবন এই সত্যনিষ্ঠ পথে অবিচল থাক। হয়তো অনেক কষ্ট হবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত জয় হবে তোমাদেরই।”

কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান তখনও অনুরণিত হচ্ছে উপস্থিত সকলের বুকে। উঠে দাঁড়ালেন ডিএসও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা। সকলের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁরা পাঠ করলেন ‘অঙ্গীকার’। মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে যাবার অঙ্গীকার বুকে নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন ছাত্রছাত্রীরা।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজারের বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকা অবসরকালীন ভাতা, ন্যূনতম বেতন মাসিক ২১০০০ টাকা সহ স্থায়ীকরণ ও প্রকল্পটির সামগ্রিক উন্নয়ন সহ ১০ দফা দাবিতে ৫ ফেব্রুয়ারি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হন। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পন্ডিত, এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এবং এ আই ইউ টি ইউ সি’র সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য এবং এ ই এফ আই-র সর্বভারতীয় সভাপতি অচিন্ত্য সিন্‌হা।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন এবং সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সভাপতি সনাতন দাস। জ্ঞানানন্দ রায়ের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়। মন্ত্রী অবসরকালীন ভাতা সহ অন্যান্য অনেকগুলি দাবি মানার আশ্বাস দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com